প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী

পঞ্চম খণ্ড

মহাকবি

নবীনচন্দ্র জন্মশতবার্ষিক-স্মৃতি-তর্পণ

দ্বিতীয় ভাগ



কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ
প্রাচ্যবাণীর যুগ্মসম্পাদক
ও
গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৩৫৭

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
যুগ্মসম্পাদক, প্রাচ্যবাণীমন্দির
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান

দাশগুপ্ত কোম্পানী
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং
১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সত্যব্রত লাইব্রেরী
১৯৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সমস্ত বড় বড় পুস্তকের দোকান
ও
প্রাচ্যবাণীমন্দির
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মুদ্রাকর
শ্রীউপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, এম্-এ (কম্), বি-এল্
আই. এন. এ. প্রেস
১১৩ নং রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভূমিকা

"নবীনচন্দ্র জন্মশতবার্ষিক স্মৃতিতর্পণ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা অত্যন্ত উৎসাহ ভরে বলেছিলাম যে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড খুব শীঘ্র প্রকাশিত হবে। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ, আমাদের সে আশা ফলবতী হয়নি। নানা দৈবদুর্বিপাকে ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬) সাল থেকে ১৩৫৭ (ইং ১৯৫০) সাল পর্যন্ত প্রায় চার বৎসর অতীত হয়ে গেল, বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হয়নি। ভগবদনুগ্রহে এখন দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করছি। এবং কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হবে, এ সুখপ্রদ আশাও হৃদয়ে পোষণ করছি।

বিস্তৃত "সম্পাদকীয়" এ খণ্ডেই দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের আয়োজন হওয়ায় এ খণ্ডে তা' দেওয়া হলো না।

এ খণ্ডে প্রকাশিত ৺হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় লিখিত "রৈবতক কাব্য" সমালোচনা প্রকাশের অনুমতি প্রদানের নিমিত্ত তাঁর সুযোগ্য পুত্রগণের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রইলাম। তাঁদের অনুমতিক্রমে পরের খণ্ডে "কুরুক্ষেত্রের" সমালোচনাও প্রকাশিত হ'বে।

নবীনচন্দ্রের অমর রচনাবলী সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আশা করি, গ্রন্থের স্বত্বাধিকারিগণের আগ্রহে এ সব গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হ'বে।

পূর্ব খণ্ডের মত এ খণ্ড প্রকাশেরও সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রাচ্য বাণীমন্দির
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট্
পোঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
২৭শে নভেম্বর, ১৯৫০
১১ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সূচীপত্র

নবীনচন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিক স্মৃতি তর্পণ

প্রবন্ধাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

কবিবর
নবীনচন্দ্র সেন ও তাঁহার রচনাবলী

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন ।

প্রাগ্‌নবীন বঙ্গদেশ

মুসলমান শাসন অবসানের পর যে সময়ে বাংলাদেশে ইংরাজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইল, সেই ইংরাজ শাসন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাও এ দেশে প্রবেশ করিল। সেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহে বাংলায় এক মহা বিবর্ত্তন দেখা দিল। সেই বিবর্ত্তনের যুগে বাংলার সমাজে বাংলার শিক্ষায় বাঙ্গালীর ধর্ম্মে এবং বাংলার সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে এক বিরাট্ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। সেই পরিবর্ত্তনের সময় মিঃ ডিরোজিও, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, রিজ, হ্যালফোর্ড প্রভৃতি ইংলণ্ড-দেশীয় পণ্ডিতগণ বাংলার শিক্ষাগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন—তাঁহাদের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যে অসাধারণ

মনীষায় এবং নানাবিষয়িণী চিন্তাশীলতায় তদানীন্তন বাংলার যুবক-সম্প্রদায় এদেশের দেশীয় শিক্ষার প্রতি ক্রমে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হইয়া হিন্দুসমাজ এবং হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন। ভিন্ন জাতি আসিয়া বাংলার জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে অধিকার করিয়া বসিল। বাংলার অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন বহু যুবক হিন্দুর ধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় মিশনারিগণের প্রচেষ্টায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় ধর্ম্মের অতি উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায়, তার উপর ইউরোপের সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাবে হিন্দুর ধর্ম্মে এবং হিন্দুর শাস্ত্রে তাঁহারা এক মহা অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। —একবারও তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মে এবং হিন্দুর দর্শনে কি আছে অথবা একেবারেই কিছু আছে কি না তাহা দেখিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইলেন না। এই দারুণ সমাজ-বিপ্লব-বন্যায় বাঙ্গালীর জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

অতিশুভক্ষণে রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, মহামানব রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর, মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা দেখাইলেন যে এযুগে ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজের সংস্কৃতি আমাদিগের যে উপকার করিয়াছে এমন আর কিছুতেই করে নাই। তাঁহারা হিন্দুকে বুঝাইলেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু আজ আত্মদর্শন করিতে শিখিয়াছে, বহির্বিষয়ক জ্ঞান আসিয়া অন্তর্বিষয়কে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা দিয়াছে—কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা তারস্বরে ইহাও ঘোষণা করিলেন, যে ইংরাজী শিক্ষা যেন আমাদিগকে অমানুষ করিয়া না তুলে, ইউরোপ যেন ভারতবর্ষীয়গণকে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিতে শিক্ষা না দেয়; তাঁহারা আরো প্রচার করিলেন যে পাশ্চাত্ত্যের প্রতি অল্প

অনুরাগ ও পক্ষপাতের ফলে বাঙ্গালী যেন তার সাহিত্যে, ধর্ম্মে এবং সমাজের প্রতি অনাস্থা বা উপেক্ষা না আনে।

রাজা রামমোহনের পর, কেহ ধর্ম্মের নব বিধানে, কেহ সন্ন্যাসী না হইয়াও সংসারে থাকিয়াই নির্লিপ্তভাবে যোগ ও বেদান্তের মধ্য দিয়া অতি মিষ্ট হৃদয়গ্রাহী এবং সহজ ও সরল ভাষায় সেবাব্রত এবং ধর্ম্মের জটিল তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, কেহ আধ্যাত্মিক তৃষ্ণায় আকুল হইয়া গোঁড়ামিপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সংস্থাপন উদ্দেশ্যে, কখনও হিমালয়ে, কখনও তিব্বতে, কখনও আমেরিকায়, কখনও ইংলণ্ডে পরিভ্রমণ করিয়া আমাদের মত জড়বাদী জীবকে ত্যাগ ও সেবার ব্রতে অনুপ্রাণিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা, অসাধারণ নির্ভীকতা এবং অপূর্ব্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া হৃদয়ের অসাধারণ তেজ ও বৈশিষ্ট্যের সহিত নব্যশিক্ষিত তদানীন্তন ও বর্ত্তমান কালের বঙ্গবাসীর সম্মুখে অপূর্ব্ব আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

তারপর আসিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এত বড় বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তি বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। ইনি বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর যুগ-প্রবর্ত্তক সাহিত্যিক এবং মহামনীষী। দীনা, সঙ্কুচিতা এবং অবহেলিতা বঙ্গভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—বঙ্কিমচন্দ্র "আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকৃতি আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব, ভক্তি স্বদেশানুরাগ—শিক্ষিত পরিণতবুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্য-

গর্ব্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। * * * বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থির ভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল, সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল জ্ঞান এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্ম্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানেই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন।"—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "আধুনিক সাহিত্য" নামক গ্রন্থে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে এই উক্তি করিয়া সাহিত্যসম্রাটের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন;

নানাবিধ উপন্যাসপ্রণয়ন ও নানা সাহিত্য এবং কাব্য আলোচনা করার পর বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী প্রতিভা অপর একদিকে ধাবিত হইল। সে দিক্ হইল নব্য শিক্ষিত বঙ্গবাসীর সম্মুখে ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ঘাটন। সে ধর্ম্ম গীতার ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। সে শক্তিসমূহকে তিনি "বৃত্তি" নাম দিয়াছেন। সে বৃত্তিগুলির অনুশীলন প্রস্ফুরণ এবং চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব এবং তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। এই তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র—"ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। পতিত হিন্দুসমাজ এবং বিস্তৃত হিন্দুধর্ম্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত বঙ্কিম "কৃষ্ণচরিত্রে" করিয়াছেন, তাহা বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী এবং প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। "কৃষ্ণচরিত্রে" দেশাচার ও লোকাচারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত খড়্গধারিণী বাণী নির্ভীক এবং নিঃসঙ্কোচে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা "কৃষ্ণচরিত্র" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন। শাস্ত্রের মধ্য হইতে "কাটিয়া কাটিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শে" শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা

স্বরূপে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন এই করাতে দুইদল শত্রুর মাঝখান দিয়া বঙ্কিমকে চলিতে হইয়াছে। একদল যাঁহারা অবতার মানেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্ব আরোপে বঙ্কিমের বিপক্ষে গেলেন, অন্যদল, যাঁহারা শাস্ত্রকে অভ্রান্ত ও আদর্শ বলিয়া মনে করেন তর্কশাস্ত্রের বিচারের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্য হিসাবে দেবতার মত গঠিত করাতে তাঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন। এই দুই দলই গোঁড়া—কিন্তু বঙ্কিম কাহারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের প্রতিভার সহায়ে, তাঁহার শাণিত খড়্গ উভয় দলের মাঝখান দিয়া তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্রে" চালাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম যাহা তর্ক যুক্তিতে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আরো লিখিয়াছেন যে, "কৃষ্ণচরিত্র" প্রকাশের পর দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—দেশময় একটা ভাবের আন্দোলনও উপস্থিত হইয়াছিল।

দেখা যায় কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা আরম্ভের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন চরিত্র বঙ্কিমের সম্মুখে উদিত হইয়াছিল; তিনি একদিকে দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে বৃন্দাবনের গোপ-গৃহে ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন, কিশোর বয়সে অসংখ্য গোপকুল-ললনাকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে প্রবঞ্চনা ও শঠতার দ্বারা জরাসন্ধ ও দ্রোণ প্রভৃতির প্রাণ সংহার করিয়া-ছিলেন;—এই সমস্ত পাপাচরণ কি যিনি ভগবান তাঁর চরিত্রে সম্ভব! —অথচ আবার দেখা যায়—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—ইহাও হিন্দুর বিশ্বাস। ওই দুইটার মধ্য দিয়া বঙ্কিমকে চলিতে হইয়াছিল। যথার্থ কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ ছিল তাহা জানিবার জন্য বঙ্কিম যতদূর সাধ্য পুরাণ ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিম বলিয়াছেন—"পাশ্চাত্ত্য

শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে আমি নিজে কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি।"—তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে তাহা সমস্তই অমূলক উপন্যাস মাত্র—তাহা বাদ দিলে কৃষ্ণচরিত্রে যাহা বাকী থাকে তাহা অতি বিশুদ্ধ পরম পবিত্র এবং অতি মহৎ। শাস্ত্রকে অন্ধের মত অনুসরণ না করিয়া তাহাকে ঐতিহাসিক যুক্তির সহিত বিচারের দ্বারা বঙ্কিম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মত আদর্শ, সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য পবিত্র চরিত্র কোন দেশের ইতিহাসে বা কোন কাব্যের কোন্ স্থানে নাই।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজের যাহা বিশ্বাস তাহা তিনি "কৃষ্ণ-চরিত্রের" পাঠককে গ্রহণ করিতে বলেন নাই অথবা কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি তাঁর "কৃষ্ণচরিত্রে" কৃষ্ণের কেবল মানব-চরিত্রেরই সমালোচনা করিয়াছেন। যে সময়ে বঙ্কিম "কৃষ্ণচরিত্র" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কিছু প্রবলভাবে হিন্দুধর্ম্ম আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল—সুতরাং সেই সময়েই কিছু বিশদভাবে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তার সমালোচনা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বঙ্কিমের মনে হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ঐ বিখ্যাত গ্রন্থের একটী সমালোচনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা "কৃষ্ণচরিত্র" পাঠ করিবেন, ঐ সমালোচনাও পাঠ করা তাঁহাদের অতীব প্রয়োজন। ঐ বিরাট সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"যে সময়ে কৃষ্ণচরিত্র রচিত হইয়াছিল, সেই সময়ের গতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই গ্রন্থে প্রতিভার একটী প্রবল স্বাধীন বল অনুভব করা যায়—সে বলটী আমাদের স্থায়ী লাভ। সেই বলটী বাঙ্গালীর পক্ষে পরম আবশ্যক। জড়ের মত শাস্ত্রের বা লোকাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া বঙ্কিম পূজা করেন

নাই। তিনি অতি সতর্কতার সহিত তাঁহার মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া পূজা করিয়াছেন;—বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, পরন্তু যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র—এই মূল ভাবটাই "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্ম শাস্ত্র—এই শক্তিই সমস্ত গ্রন্থটীকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। * * * কৃষ্ণচরিত্রের ইতিহাস রীতিমত সমালোচনা এই গ্রন্থেই প্রথম; ইতিপূর্ব্বে কেহ ইহার সূত্রপাতও করিয়া যান নাই—এই জন্য ভাঙ্গিবার এবং গড়িবার উভয়েরই ভার বঙ্কিমকে লইতে হইয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের পরম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ চাহিয়া এই সমালোচনা করেন নাই। আধুনিক কালে যে সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনার আকাশপাতাল প্রভেদ। বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্রের" দোষ এবং মহৎ গুণসমূহ রবীন্দ্রনাথ অকুন্ঠিত চিত্তে দেখাইয়াছেন—কোন স্থানে উহা দেখাইতে একটুও কার্পণ্য করেন নাই; সমালোচনার সর্ব্ব শেষে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে এত বেশী যুক্তি-তর্কের বিচার——যাহাদ্বারা সাধারণ পাঠকের মনে অখণ্ডভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কিছু বাধা দেয়। সেই স্থলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ইহাও বলিয়াছেন যে,—প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার সাজ-সজ্জা বা নেপথ্যবিধান আরম্ভ করিলে অভিনয়ের যেমন রসভঙ্গ হয়, নাটকের সৌন্দর্য্য দর্শকের মনে স্থান লাভ করিতে পারে না, সেই হেতু ষ্টেজের পশ্চাতে যবনিকার অপর পার্শ্বে সাজ-সজ্জার বিধান যেমন করা উচিত, বঙ্কিমও তেমনি নানা বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া নানা স্থান হইতে নানা সাজ-সজ্জা আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নরোত্তমবেশে সাজাইয়া দিয়া তাঁহাকে যবনিকার পিছনে রাখিয়াছেন মাত্র—এখন কোন কবি আসিয়া যবনিকা তুলিয়া অভিনয়

আরম্ভ করতঃ সর্ব্বসাধারণের মনোহরণ করিতে থাকুন, তাঁহাকে শ্রম-*সাধ্য বা চিন্তাসাধ্য বা বিচারসাধ্য* কাজ কিছুই করিতে হইবে না।”
—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে মনে হয়, কৃষ্ণচরিত্রের আরো আলোচনা হওয়া দরকার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সমুদ্র বিশেষ—ভারতের পুরাণকারগণ নানা ভাবে এবং নানা দেশে ব্যক্ত করিয়াও সেই অপার বারিধিময় চরিত্রের কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ইহা পরম সত্য যে, হিন্দুর এই পরম দেবতার চরিত্র যত বিশদ এবং পূর্ণভাবে হিন্দুসমাজে আলোচিত হয়, জাতির পক্ষে ততই মঙ্গলজনক এবং কল্যাণপ্রদ।

নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভা

উন্মেষ ও পরিপুষ্টি

বঙ্কিমচন্দ্রের পর আর একজন সাহিত্যরথী বঙ্গের সাহিত্য-রণাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর পরম পূজ্য দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আর এক মূর্ত্তি হিন্দু জনসাধারণের সম্মুখে ধরিলেন। ইনি কবিবর নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের লেখক-চক্রের মধ্যে অন্যতম লেখক ছিলেন। নবীনচন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্ত্তি বঙ্গীয় পাঠকগণের সম্মুখে ধরিলেন, উহা শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব মূর্ত্তি—যে মূর্ত্তিতে তিনি কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে অর্জ্জুন-সারথীর বেশে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন ঘোষণা করিয়াছিলেন—এ সেই মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তিতে ভগবানের মধুর ব্রজলীলার মাধুরীর পরিবেশ নাই। মথুরেন্দ্র কংশের বিনাশের সময় কিশোর শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন যৌবনে কুরুক্ষেত্রে সেই মূর্ত্তিরই বিকাশ—তবে রথী না হইয়া উহা সারথীর বেশে।

ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে শৈলমালা-পরিবেষ্টিত চট্টগ্রামের অধীন নয়াপাড়া গ্রামে বাংলা ১২৫৩ সালের ২১শে মাঘ তারিখে নবীনচন্দ্র

জন্মগ্রহণ করেন। কঠোর পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত এবং বনানী-সঙ্কুল হ্রদ-তড়াগময় ইউরোপের স্কটল্যাণ্ড দেশকে যেমন কবি-কুল-ধাত্রী বলা হইয়া থাকে, ভারতের চট্টল-ভূমিও তেমনি নবীনচন্দ্রের মত মহাকবির জননী-স্থানীয়া ছিলেন। চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ শৈলমালা, প্রশস্ত-হৃদয়া কর্ণফুলী নদী, অদূরে ভারতোৎসঙ্গপ্রক্ষালি বঙ্গোপসাগরের অনন্ত অবাধ অগাধ নীল লবণাম্বুরাশি, সমস্তই নবীনচন্দ্রের হৃদয়ের কবিত্বশক্তিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কবিবর নবীনচন্দ্র ২৫ বৎসর বয়সের সময় আনুমানিক ১২৭৮ সালে "অবকাশ-রঞ্জিনী" নামক একখানি বাংলা কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে মাসিক পত্রাদিতে এবং এডুকেশন গেজেটে কিছু কিছু লিখিতেন—"অবকাশ-রঞ্জিনীতে" নবীনচন্দ্রের নাম বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। "অবকাশ-রঞ্জিনী" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সমালোচনা করেন—ঐ সুদীর্ঘ সমালোচনার একস্থানে লিখিত আছে—"অবকাশ-রঞ্জিনী" কতকগুলি খণ্ড-কাব্যের সংগ্রহ। ইহার প্রণেতা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। তিনি যেই হউন, তিনি সুকবি এবং বিশুদ্ধরুচি; তিনি যশস্বী হইবার যোগ্য। ভরসা করি পুনর্মুদ্রাঙ্কণকালে আপনার পরিচয় দিবেন।" —তারপর যখন তাঁর "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য প্রকাশিত হয়, তখন নবীনচন্দ্রের নাম বাংলাদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।

আজ হইতে প্রায় ৭০।৭১ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ১২৮২ সালে সুদূর চট্টগ্রামের এক নবীন কবি "পলাশীর যুদ্ধ" নামক একখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য কাব্য লিখিয়া উহা দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র নামে উৎসর্গ করেন। সেই সময়ের Text Book Committee "পলাশীর যুদ্ধকে" বাংলার প্রাইমারী এবং মাইনর স্কুলের পাঠ্যপুস্তক

বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন।

—"আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন"

এবং

"ঝম ঝম ঝম করি বৃটীশ বাজনা
কাঁপাইয়া রণস্থল
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।"

—নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধের" এই সমস্ত লাইন তদানীন্তন স্কুলের ছাত্রবৃন্দের মনে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে এক নবীন উৎসাহ এবং ভাবধারা আনিয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যতে যে মহা-কবির স্বর্ণ-লেখনী হইতে "রঙ্গমতী" "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" "প্রভাস" প্রভৃতি মহাকাব্য বাহির হইয়াছিল, এই পলাশীর যুদ্ধই তাহার অগ্রদূত। ১২৮২ সালের "বঙ্গদর্শনের" ৭ম সংখ্যায় "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য সমালোচিত হইয়াছিল—সমালোচনার শেষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"আমরা পলাশীর যুদ্ধের কবিকে বাংলার Byron বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। 'পলাশীর যুদ্ধ' যে বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উপসংহারে পাঠকদিগকে আমরা একটি কথা বলিব। পলাশীর যুদ্ধের, আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালী-জন্ম বৃথা।" ১২৮৮ সালের ৪র্থ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে মহাকবির "রঙ্গমতী" কাব্যের সমালোচনা হয়। ঐ সমালোচনায় লিখিত আছে—পলাশীর যুদ্ধে নবীনবাবু যখনই মাতৃভূমির দুঃখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা তখনই গৈরিক নিঃস্রববৎ তীব্র উদ্দীপনা

উদ্গীর্ণ করিয়াছে, সেই মর্ম্মভেদী রোদন "রঙ্গমতীর" অস্থি-পঞ্জর। "রঙ্গমতী" কাব্যের কেন্দ্র আছে, বীজ আছে—সুতরাং কবি কাব্য-সোপানে আর একপদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সকলেই জানেন, কবিবর নবীনচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা এক শাসন-কর্ত্তার অধীনে ছিল। রাজকার্য্য উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে অবস্থান কালে এক দিকে সমুদ্রমেখলা ভারতের প্রান্তদেশ, অপর দিকে নীলাচলে ভগবানের নীলমাধব মূর্ত্তি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া কবি নবীনচন্দ্রের মনে কৃষ্ণপ্রেম জাগ্রত হয়। তথা হইতে মহাভারতীয় প্রবলপ্রতাপ রাজা জরাসন্ধের রাজধানী রাজগিরিতে অবস্থান কালে তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া "উদ্বেলিতহৃদয়ে" কাব্যজগতের দ্বিতীয় হিমাদ্রিস্বরূপ বিপুল মহাভারত গ্রন্থ মহাকবি আর একবার পাঠ করেন। সেইখানেই "রৈবতক" কাব্যের প্রথম সূচনা হয় এবং মহাভারতের সেই পবিত্র শৈলমালার ছায়ায় "রৈবতকের" প্রথমাংশ রচিত হয়।

ভারতবর্ষে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনকারী ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আদ্য লীলা লইয়া "রৈবতক" কাব্য রচিত। "কুরুক্ষেত্র" তাঁহার অনন্ত-কালস্পর্শী মধ্য লীলা এবং "প্রভাস" তাঁহার অন্তিম লীলা লইয়া রচিত। প্রায় ৬২ বৎসর বয়সে নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়। নবীনচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহিত্য-সাধনা করেন; তাহা হইলে দেখা যায়, নবীনচন্দ্র জীবনের বহু বৎসর পর্য্যন্ত বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাত্র ৪৯ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র ৩।৪ বৎসর কাল তিনি মাতৃভাষার সেবা করিয়া মাতৃভাষাকে বিবিধ ভূষণে সাজাইয়া গিয়াছেন। অলৌকিক বঙ্কিম-প্রতিভা মাত্র ৫৬

বৎসরেই নিবিয়া যায়। অপরাজেয় শরৎচন্দ্রের দীপ্ত-প্রতিভা বাংলার সাহিত্যাকাশে বহুদিন প্রজ্বলিত থাকিতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য-রণভূমির সব্যসাচী রথী একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সুদীর্ঘ ৮১ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া আমাদের জননী-স্বরূপিণী মাতৃ-ভাষার পাদ-পীঠে বিবিধ পুষ্পের অঞ্জলি দিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নবীনচন্দ্র জীবনের বহু বৎসর পর্য্যন্ত বাংলা সাহিতের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল বাংলার কোন কবিই কবিতা-মাধুর্য্যে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না বলিলেই হয়। নবীনচন্দ্র মহাভক্ত কবি ছিলেন। যে ভক্তির আসনে জয়দেব চণ্ডীদাস প্রভৃতি অধিষ্ঠিত আছেন, নবীনচন্দ্রের আসনও তাঁহাদের মধ্যে। ভক্তির উচ্ছ্বাসেই তিনি তাঁর অমর মহাকাব্যসমূহ লিখিয়াছিলেন। "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" বাহির হইলে মনীষী স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সহিত যে সমস্ত পত্রালাপ করেন, তাহা পড়িলেই বোঝা যায় যে, নবীনচন্দ্র কোন অপার্থিব প্রেরণায় ঐ সমস্ত কাব্য লিখিয়াছিলেন।

রৈবতক কাব্য

"রৈবতকে" কবিবর নবীনচন্দ্র খণ্ড ভারতে এক মহাভারত স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। একদিকে দুর্ব্বাসাপ্রমুখ ঋষিগণ নানাবিধ ক্রিয়াকলাপপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও বেদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে উন্মুখ, অপরদিকে দুর্য্যোধন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভগদত্ত প্রভৃতি অসংখ্য অধার্ম্মিক পরপীড়ক ও প্রজাপীড়ক ক্ষত্রিয়গণ অশ্বমেধ রাজমেধ প্রভৃতি যজ্ঞদ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্য বিস্তারে ভারত-সাম্রাজ্যকে করতল-গত করিয়া সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইতে সচেষ্ট—এই উভয় বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সহায়তায় কিরূপে ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারগ হইয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার "রৈবতক" কাব্যে তাহাই

দেখাইয়াছেন। এই বেদ-প্রবণ দেশে সেই বেদ-প্রবণ সময়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ঘোষণা করিলেন—"বেদে ধর্ম্ম নাই ধর্ম্ম লোকহিতে।"—তারস্বরে এই মহাবাণী ঘোষণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন যে, হস্তিনা পাপে পরিপূর্ণ। পুরাণ কাব্যের ভাষায় বলিতে গেলে, সে সময় হস্তিনায়—

"দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥"

অন্য দিকে ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন যে, তথায়—

"যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে"

তাই এই পাণ্ডব-শক্তিসমৃদ্ধিকে জগতের কার্য্যে নিয়োজিত করিবার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল—বৃন্দাবনে গোচারণের কালে নির্জ্জনে স্বর্গ হইতে যে এক মহা সংগীত শুনিয়া তাঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, আজ কৈশোর উত্তীর্ণে সেই ত্রিদিবসংগীত আবার শুনিলেন—শুনিলেন যেন কোন অশরীরিণী বাণী গাহিতেছে—

"অশান্তি-পূর্ণ জগতের হাহাকার
পশে না কি শ্রবণে তোমার ?
সাম্রাজ্যে সমাজে ধর্ম্মে কোথাও না পাই শান্তি
জগত করিছে হাহাকার।

অন্তর বিগ্রহ-বহ্নি জ্বলিতেছে রাজ্যে রাজ্যে
কিবা ঘাত কিবা প্রতিঘাত

* * * * *

কি দারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছে নিরন্তর :—
কাঁদে না কি হৃদয় তোমার ?
নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম্ম যজ্ঞ নহে পূর্ণ কর্ম্ম
ধর্ম্ম কৃষ্ণ ! সর্ব্ব ভূত-হিত।
তাহার সাধন কর্ম্ম নারায়ণে কর্ম্মফল
ভক্তিভরে করি সমর্পিত
উত্তীর্ণ কিশোর তব, হও কর্ম্মে অগ্রসর
জগত করিছে আবাহন
কাতর করুণ কণ্ঠে হও অগ্রসর কর
জগতের দুঃখ বিমোচন।

সেই অনন্ত মঙ্গলময় এবং অনন্ত করুণাময়ের নিকট হইতে এই অপার্থিব সংগীত শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে আবার ভাসিয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; শুনিলেন যেন জগতের নরকণ্ঠ, করুণার সংগীত গাহিয়া ডাকিতেছে—

"দয়াময় ! দেখ দুঃখময় ধরা,
ধরার এ দুঃখভার করিয়া মোচন
কর কৃষ্ণ আমাদের উদ্ধার সাধন।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ব্যাসদেব, মহামুনি গর্গ প্রভৃতি ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণের জ্ঞানবলের সহায়তায় এবং যাদব ও পাণ্ডবশক্তির ভুজবলের সহায়তায় ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরশুরামের মত জননীস্বরূপিণী ভারতবর্ষকে অধার্ম্মিক ক্ষাত্রশক্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী এবং

অসীম রাজনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের ভিত্তি কিরূপে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন "রৈবতকে" কবি তাহারই উন্মেষ দেখাইয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের প্রত্যেক রচনা তাঁহার অন্তর্নিহিত ভক্তি অসীম সৌন্দর্য্য-বোধ মানসদৃষ্টি ও কল্পনার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে পরিস্ফুট এবং অনায়াসে পাঠ্য। অতিশুভক্ষণে মহাকবি মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দকে বাংলা সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ঐ অমিত্রাক্ষর ছন্দকে নবীনচন্দ্র অপূর্ব্ব সাবলীল এবং জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

পরবর্ত্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের হাতে মাইকেলের ছন্দ যেরূপ তর তর ধারে অবলীলায় বহিয়া গিয়াছে, নবীনচন্দ্র তাহার অগ্রদূত—নবীনচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দকে অতীব সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্য, পাঠকের মনকে স্পন্দিত করিয়া দেয়।

রৈবতকের বহু সর্গ অতীব সুন্দর।—প্রথম সর্গ-যেখানে প্রভাসের সমুদ্রতীরে—যথায় কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় শিলাসনে প্রায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন, দেখিলেন ধীরে ধীরে পৃথিবীতে উষার প্রথম আলোক বিকীর্ণ হইতেছে, দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের পূর্ব্বপ্রান্ত জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে সেই বহ্নি-শিখা লহরে লহরে সিন্ধুসলিলে এবং ধূসর আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে সেই বহ্নিরাশির মাঝে একটী সিন্দূরের রেখা সহসা ভাসিয়া উঠিল। কবির বর্ণিত সেই দৃশ্য অতীব হৃদয়গ্রাহী। তারপর সেই সিন্দূরের রেখা ক্রমে স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখায় একখানি সুবর্ণ-নির্ম্মিত সুবঙ্কিম ধনুকের আকার ধারণ করিল এবং ঐ স্বর্ণ-ধনু হইতে যেন স্বর্ণ-শরমালা আকাশে ছড়াইয়া পড়িল। তার পরেই সমুদ্রবক্ষ হইতে সেই স্থানে একটী সুন্দর অর্দ্ধচন্দ্র ভাসিয়া উঠিল—সেই অর্দ্ধচন্দ্র ক্রমে একটী সিন্দূরের কলসীবৎ পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া নীলাম্বুরাশির উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে নাচিতে

লাগিল—কলসীর গ্রীবাদেশ কিন্তু সমুদ্রসলিলকে স্পর্শ করিয়া আছে। ক্রমে সেই রক্তাভ কলসীর গ্রীবা সমুদ্রসলিলে মিশিয়া গেল। নীলাম্বুরাশির সহিত ঐ সিন্দুরকলসী মিশিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-বারিমধ্য হইতে এক লম্ফে যেন সহস্রাংশু দেব দিবাকর *নীলাকাশে উঠিলেন। সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—*

"একেবারে ঋষিদের বহু শঙ্খ মিলি
নবোদিত প্রভাকর করি আবাহন
উঠিল ধ্বনিয়া। সেই প্রফুল্ল নিক্কণ
গম্ভীর জলধি-মন্দ্রে না হইতে লয়
আরম্ভিলা ঋষিগণ স্তব সুগভীর।"

যাঁহারা ৺পুরীধামে সমুদ্রের দিক্‌চক্রবালে সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের এই অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এইরূপ বহু সুন্দর স্থান রৈবতকে আছে। ব্যাসাশ্রমের বর্ণনা, ব্যাসের আশ্রমে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সমাগম যাহা তৃতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও অতীব সুন্দর। অর্জ্জুনের প্রতি সুভদ্রার অনুরাগ, শৈলজার অর্জ্জুনের উপর অনুরাগ প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের খনি "রৈবতক" কাব্যের মধ্যে দেখা যায়। রৈবতকের দ্বাদশ সর্গে কবির কল্পনা অতি উচ্চস্তরে উঠিয়াছে। কল্পনাই কাব্যের প্রাণ, কল্পনা-বিহীন কবিতাকে কাব্য বলা যায় না, উহাকে Verse বলাই সঙ্গত। তাই মহাকবি মধুসূদন তাঁর অমর কাব্য "মেঘনাদ-বধের" প্রথম সর্গে কল্পনা-দেবীকে আবাহন করিয়া লিখিয়াছেন—

"তুমিও আইস দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত ফুলবন-মধু
ল'য়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

রৈবতকের দ্বাদশ সর্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি ব্যাসদেব এবং অর্জ্জুনকে ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের মহাব্রত গ্রহণ করাইলেন। এইস্থানে কবির বর্ণনা অতীব মনোরম ও পবিত্র। ঐ মহাব্রত গ্রহণ করিবার সময় ব্যাসার্জ্জুন ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া দেখিলেন, গোধূলি সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের কি এক মহিমময় বিরাট মূর্ত্তি দীপ্তি পাইতেছে —যেন কৃষ্ণের সেই মানব মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। কৃষ্ণের নীল বপু দিয়া যেন অসংখ্য সুধাংশু কিরণ বহিয়া যাইতেছে। সেই সন্ধ্যার স্বচ্ছ অন্ধকারে ব্যাসার্জ্জুন দেখিলেন, সেই বাসুদেব মূর্ত্তি আর নাই —দেখিতে দেখিতে সেই দীপ্তিমান নীল বপু বর্দ্ধিত হইয়া এই বিশ্ব-চরাচর ছাইয়া ফেলিল। তাঁর পদতলে অনন্ত অসংখ্য শত-দলের মত সবিতৃমণ্ডল শোভা পাইতেছে। সুদর্শন-চক্র ও শঙ্খ হস্তে রাজ-রাজেশ্বর মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সম্মুখে যেন নারায়ণ আবির্ভূত হইয়াছেন—বদনে কি শোভা, নয়নে কি জ্যোতি, কি এক অপার্থিব আলোক—অনন্তব্যাপিনী প্রকৃতিতে পুরুষের কি এক অপূর্ব্ব সম্মিলন, বিশ্বচরাচর কি এক একত্বে পরিণত হইয়াছে। কবিবর নবীনচন্দ্র ভগবানের এই বিশ্বরূপ বর্ণনা করিবার সময় যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন—ভাষা যেন মধুর এবং অতিপবিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাকবির লেখনীমুখে আবির্ভূত হইয়াছে—তাই ঐ সর্গের শেষে মহাকবি, নারায়ণ ব্যাসদেব ও বীরচূড়ামণি অর্জ্জুন—এই ত্রি-মূর্ত্তির উদ্দেশে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে প্রাণের পূজা নিবেদন করিয়া অতি ব্যাকুলভাবে লিখিয়াছেন—

"অমর ত্রি-মূর্ত্তি! দাসে দাও পদধূলি
পবিত্র চরণামৃত। নয়ন ভরিয়া
দেখিব ত্রি-গুণ রূপ তিষ্ঠ একপল।

সর্ব্বধ্বংসী মহাকাল বহিছে মস্তকে
যে পবিত্র পদচিহ্ন যুগ যুগান্তর
সেই পদাম্বুজ দাস করিয়া ধারণ
ভক্তিভরে শিরোপরে গাইবে ভারতে
অক্ষয় কীর্ত্তির গান অমৃত সমান
বিহ্বল হৃদয়ে দাস—দাও পদাশ্রয়
কহ দেবত্রয় দাসে, কহ দয়া করি
সশরীরে আবির্ভাব আবার কখন
হইবে ভারতে ? কহ হবে কি কখন ?
নারায়ণ নরোত্তম কহ দয়া করি
তব ভাগবত প্রভো হবে কি বিফল
পূর্ণকাল, পূর্ণব্রহ্ম ! আসিবে কখন ?

ভক্ত কবির ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা, "রৈবতকের" প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষার মাধুর্য্যে, ছন্দের লালিত্যে, পদ্ধতির নূতনত্বে এবং ভাবের পবিত্রতায় "রৈবতক" নবীনচন্দ্রের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে লিখিয়াছেন—"সুন্দর ভাষা কাব্য সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ। ছন্দ এবং ভাষার সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য কাব্যের পক্ষে সাংঘাতিক।"—কবিবর নবীনচন্দ্রের "রৈবতক" কাব্যে ভাষা ও ছন্দ উভয়ের মিলন-মালায় যে রঙের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে সকলেরই মন মুগ্ধ হইয়া যায়। নবীনচন্দ্রের কাব্যসমূহ চির নবীন। আজ এই নবীনের জয়যাত্রার দিনে নবীনচন্দ্রকে পুরাতন বলিলে চলিবে না। আমরা যদি পল্লবগ্রাহী না হইয়া, নবীনচন্দ্রের কাব্যসমূহ ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, নবীনচন্দ্র কখনও পুরাতন হইবেন না।

কুরুক্ষেত্র কাব্য

"রৈবতকের" পরের কাব্য কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "কুরুক্ষেত্র"। "কুরুক্ষেত্র" কাব্য খুলিলেই একটী অতিপবিত্র দৃশ্য পাঠকের নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। মহর্ষি ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন—কারণ এই মহাক্ষেত্রেই ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছিল এবং এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই সে সময়কার খণ্ড ভারতকে একীভূত করিয়া এই মহাভারতে পরিণত করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মক্ষেত্রের অদূরে এক বট বিটপি-ছায়ায় দাঁড়াইয়া ব্যাসদেব এবং তাঁর এক শিষ্য। শিষ্যের উত্তরীয় অঞ্চলে একখানি "গীতা" বাঁধা রহিয়াছে। শিষ্য দারুণ সংশয়াচ্ছন্ন—সংশয়াচ্ছন্ন শিষ্যকে ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বিরাটত্ব বুঝাইয়া দিতেছেন—বুঝাইয়া দিতেছেন যে কুরুক্ষেত্রের সেই ভীষণ ধ্বংস-যজ্ঞ কি করিয়া ধর্ম্মশিক্ষায় পরিণত হইবে—কি করিয়া সেই জীবহিংসা এবং সেই সর্ব্বজীবের বিনাশ জীবে দয়া এবং সর্ব্বজীবের হিতের নামান্তরে পরিণত হইবে। মহর্ষি ব্যাসদেব শিষ্যকে আরো বুঝাইলেন যে, ধর্ম্মের গ্লানি, অসাধুর আধিপত্য, সাধুদের হাহাকার এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান এই সমস্ত—

"———————পাপভার
করিতে মোচন আর করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্ম্মরাজ্য, করিতে প্রচার
ভারতে মহাভারত—কৃষ্ণ-অবতার।"

সুতরাং এই সমস্ত মহাকাব্য——————

"সাধিবারে অনিবার্য্য হ'লো ধর্ম্মরণ।"

কারণ, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম্ম। বীরব্রতে ধর্ম্মরণে জীবন পরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের স্বর্গ, এইরূপেই এই ধ্বংস-যজ্ঞেই মানবসমাজ রক্ষা হইয়া আসিতেছে—কারণ ভগবান্ নির্লিপ্ত—

"ভগবান্ কর্ম্মরত ! বিপুল সংসার
কর্ম্মক্ষেত্র, নাহি কারো তিলার্দ্ধ বিশ্রাম।
জগতের সুখ মাত্র, সুখ আপনার
আমি জগতের অংশ—এ নিঃস্বার্থ ভজন
যার কর্ম্মমূলে, কর্ম্মফলে কদাচন
নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার, নির্লিপ্ত সে জন।"

মহর্ষি ব্যাস শিষ্যকে আরো বুঝাইলেন যে, আজ কুরুক্ষেত্রে যে মহারথ নিরস্ত্র অবস্থায় অর্জ্জুনের সারথিব্রতে ব্রতী—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমমণ্ডিত নিষ্কাম এবং নির্লিপ্তের পবিত্র চিত্র, জগতের সম্মুখে আদর্শ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। দেখিবে যে, সে চরিত্রের কোথাও একটুও স্বার্থের ছায়া নাই। ব্যাস-শিষ্য তথাপি সংশয়াচ্ছন্ন—সংশয়াচ্ছন্ন শিষ্যকে ব্যাসদেব আরো বলিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে কাতর অর্জ্জুনকে যে গীতামৃত পান করাইয়া—

করিলা স্বধর্ম্মে রত, যোগধ্যান ধরি
করিয়াছি সংকলন—পরিতৃপ্ত প্রাণ
সেই গীতা উত্তরীয় অঞ্চলে তোমার।"

আজ শরশয্যাশায়ী পরম ভাগবত শান্তনু-তনয় ভীষ্ম ভগবানের মুখ-নিঃসৃত সেই গীতার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য আকুল হৃদয়ে আছেন। তুমি পুণ্য-তোয়া হিরণ্বতী-তীরে পাণ্ডব-শিবিরে যাও, তথায় গিয়া সুভদ্রার করে, এই মহা-গ্রন্থ সমর্পণ কর—সুভদ্রাই দেবব্রত ভীষ্মকে এই গীতা শোনাইবেন—আমার আশীর্ব্বাদসহ সুভদ্রার করে এই গ্রন্থ দিয়া বলিবে—

"যেই ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্
সুভদ্রে, তোমাতে নিত্য, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত
তব পতি বীরবর, পার্থ মহারথী
এই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম ভাষায় চিত্রিত।

বিরাজিত সেই চন্দ্র, সুধার আধার
তব বক্ষে এই গীতা জ্যোৎস্না তাহার ॥
মিলিয়াছে মোক্ষ-সুধা যুগ যুগান্তর
যার তরে যোগিগণ করিতেছে ধ্যান
মানবের কর্ম্মাকাশে ধর্ম্ম ধ্রুবতারা
জানিলাম এতদিনে হ'লো সমুদিত
অনন্ত কালের তরে অন্ধ দিক হারা
দেখিবে গন্তব্য পথ মানব পতিত
গীতার এ রঙ্গভূমি মহাতীর্থ মত
কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে হবে পরিণত।"

এই সুন্দর এবং পবিত্র চিত্র লইয়া "কুরুক্ষেত্র" আরম্ভ। সৌন্দর্য্যে কবিত্বে পবিত্রতায় এবং মাধুর্য্যে কবিবর নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" অপর একখানি অতুলনীয় মহাকাব্য। "কুরুক্ষেত্র"—শোক-কাব্য। নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন, অর্জ্জুনকে ভগবান্ ধর্ম্মযুদ্ধে রত করাইবার জন্য গীতার মহাকাব্য শোনাইবার পরও অর্জ্জুন যেরূপভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহাতে দেখা গেল, অর্জ্জুনের হৃদয় হইতে—

"গোবিন্দের মহাকাব্য গীতার সান্ত্বনা
বীরত্বের সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা কঠোর
গিয়াছে ভাসিয়া।"

কারণ অর্জ্জুন মানুষ—মানুষ পদে পদে কঠোর কর্ত্তব্য হইতে অবিরত চ্যুত হইয়া থাকে—ইহা মানুষেরই স্বভাব। শ্রীকৃষ্ণ—মানবহিত যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, পাণ্ডব-শক্তি কিরূপে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে সহায়তা করিবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে যিনি রৈবতকের দুর্গে এবং কুরুক্ষেত্রে কত অতন্দ্র রজনী যাপন করিয়াছেন, যিনি নিরস্ত্র হইয়াও অস্ত্রীর মত কত কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, সর্ব্বশক্তি এবং সর্ব্ববিদ্যা করায়ত্ত করিয়া

যিনি কত রাজনীতি, কত দণ্ডনীতি, কত ভেদনীতি, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—

"যদি কোন ঘটনার ভীষণ আঘাত
নাহি করে এ হৃদয় কুলিশ-কঠিন,
এইরূপে দ্রোণাচার্য্য মৃত্যু অভিনয়
বিভীষণ করিবেন আরো কতদিন।
গুরুভক্ত ধনঞ্জয় করুণ হৃদয়
গুরুসহ করে মাত্র রণ অভিনয়।

সুতরাং অর্জ্জুনের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর আবশ্যক হইল—আর সেই মৃত্যু কৌরবদিগের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অতি ঘৃণ্য-জনোচিত উপায়ে সংঘটিত হইবে, ইহাও বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা। সুতরাং অভিমন্যু বধের পর হইতেই অর্জ্জুন বুঝিলেন—

"এই শোক শিক্ষা অর্জ্জুনের।"

তাই সেই গভীর নিশীথে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে কৌরব-শিবিরের দিকে চাহিয়া ক্রোধোন্মত্ত অর্জ্জুন কহিলেন—

বুঝিলাম এই শোক শিক্ষা অর্জ্জুনের
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বুঝিলাম হায়।
এত দিনে এত দূরে; বুঝিলাম আর
ধনঞ্জয় শ্লথ করে আবৃত অসিতে
যুঝিয়া করিতেছিল বৃদ্ধি নরমেধ
মায়াবশে ভ্রান্তমতি; সপ্তরথী আজি
খুলিল অসির সেই স্নেহ আবরণ
শাণিত করিল ধার, করিল সঞ্চার
শ্লথ করে বিদ্যুতাগ্নি, খুলিল নয়ন
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বুঝিনু এখন।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন "গীতার" সার্থকতা এইখানেই আরম্ভ হইল। নিষ্কাম এবং দেবোপম কুমার অভিমন্যুর মৃত্যুর পর হইতেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নূতন পর্য্যায়ে প্রবেশ করিল—নবীনচন্দ্র ইহাই দেখাইয়াছেন। আজ "গীতার" কর্ম্মবাদ ঘুচিয়া গিয়াছে—তাই কঙ্কাল অবশিষ্ট হইয়া কেবল জড় পুত্তলিকার মত আমরা কতকগুলি ক্রিয়া-কাণ্ড লইয়া ঘুরিতেছি এবং অন্ধ ও মোহগ্রস্তের মত ভাবিতেছি—ইহাই বুঝি মোক্ষের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে। ত্যাগ লোক-হিত এবং আত্মদান যাহা মানুষ হইবার সন্ধান এবং মোক্ষের সন্ধান দেয়, সে পথের দিকে আমরা চাহিব না। কোন কর্ত্তব্য করিব না, স্বার্থত্যাগ কিছু করিব না, অথচ ভগবান্ আমাদিগকে মোক্ষের পথে লইয়া যাইবেন এই যেন এখনকার ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গীতার ধর্ম্ম—গীতার লিখিত নিষ্কাম ধর্ম্ম আমরা পালন করি না। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেও আজ আমরা বিমুখ। জগতে অতুলনীয় কর্ম্মদ্বারা, রাজপুত্র হইয়াও অসীম দুঃখ ভোগের দ্বারা, শিক্ষার পারদর্শিতার দ্বারা, সীমাহীন অধ্যবসায়ের দ্বারা, অমানুষিক স্বার্থত্যাগের দ্বারা পাণ্ডবেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন এবং সাহায্য পাইয়াছিলেন—যে নিজেকে সাহায্য করে, ভগবান্ তাহারই সাহায্য করেন, এই মহানীতি বাক্য পাণ্ডবেরাই পালন করিয়াছিলেন—তাই তাঁহারা ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারগ হইয়াছিলেন;—আমরা যেমন সমস্ত কার্য্যে সহজ পন্থা অন্বেষণ করি, পাণ্ডবেরা সেরূপ কোন সহজ পন্থা অনুসরণ করেন নাই—তাই অভিমন্যুর মৃত্যুর পর অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন—

"এখন এই অসি অর্জ্জুনের
অজস্র শোণিত উৎস করিবে খনন
অধর্ম্মী অরাতি বক্ষে; গর্জ্জিবে গাণ্ডীব

প্রলয়ের মেঘমন্দ্রে ; ছুটিবে আয়ুধ
কেন্দ্রভ্রষ্ট প্রলয়ের সূর্য্যগণ মত।
পারিল না পিতা, পুত্র করিলা স্থাপিত
আজি ধর্ম্মরাজ্য দিয়া আত্ম-বলিদান।
বাজাও বিজয় শঙ্খ, মহারথিগণ
কালি জয়দ্রথে বধি, ষষ্ঠাহ অতীত
না হইতে অরিকুল করি নির্ম্মূলিত
আমরা করিব সেই সাম্রাজ্য ঘোষিত।"

অর্জ্জুনের এই বীরোচিত এবং মনুষ্যোচিত প্রতিজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় আনন্দে মাতিয়া উঠিল, তাই সেই গভীর নিশীথে দারুণ শোকোচ্ছ্বাসময়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণমধ্যে—

"মহাশব্দে পাঞ্চজন্য উঠিল বাজিয়া
দেব-দত্ত শঙ্খ সহ ; বাজিল তখন
সহস্র সহস্র শঙ্খ ; ঝটিকাগর্জ্জন
উঠিল ভরিয়া যেন সায়াহ্নগগন।"

"কুরুক্ষেত্র" কাব্যে বহু রমণীয় স্থান আছে—উত্তরা-অভিমন্যুর মধুর এবং প্রীতিপূর্ণ সংলাপ, অভিমন্যুকে সুভদ্রার আশীর্ব্বাদ, শৈলজা-সুভদ্রা, ভীষ্ম-ব্যাস-শ্রীকৃষ্ণ এবং দুর্ব্বাসা-কর্ণ সংবাদ, অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা, বীরের শোক, অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা, উত্তরার খেদ, সর্ব্বশেষ যুদ্ধ অন্তে অধর্ম্মের মহাশ্মশান কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা—এই সমস্ত স্থান অতি সুন্দর ; তদুপরি "শৈলজা, জরৎকারু, সুলোচনা এবং সুভদ্রা" এই কয়টী চরিত্র অতি মনোরম এবং তাহার মধ্যে আবার "সুভদ্রা" চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিত্র। কবিবর নবীনচন্দ্রের এই সমস্ত কাব্য-সৌন্দর্য্য যখন মনে হয়, তখন কবে কোথায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি কবি কোন্ স্থানে ক্ষীণ কটাক্ষ করিয়াছেন, অথবা অনার্য্যের প্রতি কবিবর যে কিছু অধিক

প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আদৌ মনে হয় না বা তাহা আদৌ দেখিবার জিনিষ নহে। কোথায় মূল মহাভারতকে কবি কখন লঙ্ঘন করিয়াছেন বা নবীনচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন নূতন মহাভারত রচনা করিয়াছেন কি না তাহাও খুঁজিয়া বাহির করার কোন প্রয়োজন নাই,—কেবল মাত্র ইহা-ই দেখিতে হইবে যে কাব্যকার রস-সৃষ্টিতে সিদ্ধকাম হইয়াছেন কি না এবং কবির কাব্যে পাঠকের মনকে অভিভূত করে কি না, ইহাই দেখিবার জিনিষ—কারণ কবি কখনও উপদেষ্টা বা প্রচারকের আসন গ্রহণ করেন না। উপদেষ্টা বা প্রচারকের বহু উর্দ্ধে কবির স্থান। কবির কাব্যে যদি উপদেশ বা ধর্ম্মতত্ত্ব পুংখানুপুংখ রূপে অনুসন্ধান করিতে কেহ চান, তবে তাঁহার কাব্য বা উপন্যাস না পড়িয়া বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ বা ধর্ম্মতত্ত্ব-পূর্ণ পুরাণ সংহিতা পাঠ করা উচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি "কুরুক্ষেত্র" কবি নবীনচন্দ্রের একখানি অতুলনীয় মহাকাব্য—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে মহাকবি বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন—কুরুক্ষেত্র লিখিতে লিখিতে মহাকবির কপোল বহিয়া প্রেমধারা যেন বহিয়া গিয়াছে, অশ্রুজলে তাঁহার লেখা যেন ভাসিয়া গিয়াছে। "কুরুক্ষেত্রের" প্রতি ছত্রে ছত্রে "গীতার" বাণী এবং সুমধুর কৃষ্ণনাম ফুল্লকুসুমের মত প্রস্ফুটিত হইয়া পাপ-তাপপূর্ণ এই ধরাতলকে যেন কি এক উচ্চতর স্বর্গে পরিণত করিয়াছে। ভীষ্মের মত আকুল হৃদয়ে মহাকবি বলিয়াছেন—

"জন্ম জন্মান্তরে তারে ভকত বৎসল
সেই স্বর্গে, পদাম্বুজ-প্রান্তে দিও স্থান
দয়াময়! ছিন্ন এবে সংসার বন্ধন
দাও শিরে পদ, মুখে দাও কৃষ্ণনাম।

আমি নহি ভীষ্ম, তুমি নহ বাসুদেব
আমি ভক্ত, দেখিতেছি তুমি ভগবান
শঙ্খ-চক্র-ধর-হরি ; পতিত পাবন
দাও শিরে পদ, মুখে দাও কৃষ্ণনাম।”

কবিবর নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যদেব, যীশুখৃষ্ট এমন কি হজরত মহম্মদকেও ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদার এবং পবিত্র মুখনিঃসৃত—

“যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥”

এই মহাবাণীর উপরও কবিবর নবীনচন্দ্রের ঘোরতর বিশ্বাস ছিল।

হিন্দু যখন এ জগৎ হইতে মহাপ্রয়াণ করে, হিন্দুর তখন প্রধান কাম্যই হইয়া দাঁড়ায় পুত্রের মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ। নবীনচন্দ্রের এক পুত্রের মৃত্যুর পর যে পুত্র জীবিত ছিলেন, তাহার নাম নির্ম্মলচন্দ্র। নবীনচন্দ্র একান্ত পুত্রবৎসল পিতা ছিলেন—পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের নাম তিনি তাঁহার কাব্যসমূহের বিশেষতঃ তাঁহার “অমৃতাভ” কাব্যের বহুস্থানে সংযোজিত রাখিয়াছেন। “কুরুক্ষেত্রের” শেষ সর্গে শোক-সন্তপ্ত ভক্ত হিন্দু মহাকবি নবীনচন্দ্র পতিতপাবন লীলামাধব জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের করুণা ভিক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন—

নিগুর্ণ নবীন তৃণে অঙ্কুরিয়া দুটী ফুল
একটী পড়িল ঝরি অকালে পুষ্পমুকুল
তোমার পবিত্র অঙ্কে। নির্ম্মল কোরক আর
আছে তার প্রেম বৃন্তে। এই কলি সুকুমার

ফুটাইয়া প্রেমকরে, হৃদয়েতে দলে দলে
লিখিও তোমার নাম পিতৃ-প্রেম-অশ্রুজলে
দিও জ্ঞান ভক্তিবল। দিও শিক্ষা আত্মদান
দিও পদাম্বুজছায়া। ধর্ম্মরাজ্যে দিও স্থান
শুনিতে শুনিতে যেন পুত্রমুখে কৃষ্ণনাম
নবীনের হয় এই অপরাহ্ণ অবসান।"

সত্য সত্যই নবীনচন্দ্রের জীবন-অপরাহ্ণ এইরূপেই অবসান হইয়াছিল। ইংরাজি ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতায় University Institute-এ (পুরাতন বাড়ীতে) যে একটী শোক-সভা হয়, ঐ সভায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (Mr. D. L. Roy) সভাপতি হইয়াছিলেন—সভাতে নবীনচন্দ্রের প্রিয়বন্ধু শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি তদানীন্তন কলিকাতার বহু জ্ঞানী ও গুণিগণের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নবীন-চন্দ্রের "রৈবতকের" তৃতীয় সর্গ হইতে ব্যাসদেবের কথিত নিম্ন কয়েকটী লাইন আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

"সত্য বাসুদেব!
বড় শোচনীয় দশা আজি ভারতের
স্রষ্টার বিপুল সৃষ্টি, জানিও নিশ্চয়
স্বেচ্ছাচারে নহে, বৎস, চালিত রক্ষিত।

* * *

বিশ্বরাজ্য দেখ বাসুদেব
রাজত্বের মহাদর্শ। নহে পশুবল
ভিত্তি কিংবা, হে কংসারি, নিয়ম ইহার

বিশ্বরাজ্য প্রীতিরাজ্য রাজত্ব দয়ার
বিশ্বরাজ্য ন্যায়রাজ্য রাজত্ব নীতির।
ক্ষুদ্র বন-পুষ্প হতে অনন্ত গগন—
সর্ব্বত্র অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কৌশল
সর্ব্বত্র অনন্ত প্রীতি। হেন মহারাজ্য
যত দিন যদুশ্রেষ্ঠ না হবে স্থাপন
তত দিন আর্য্যরাজ্য, জানিও নিশ্চয়
ভীষণ কালের স্রোতে বালির বন্ধন।”

দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্র নাথ দত্তের আবৃত্তি, বহু বর্ষ পরে আজিও যেন কানে ঝঙ্কার দিতেছে। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের বক্তৃতায় জানিতে পারি যে, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ লালদীঘি-পার্শ্বে যে একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাহার পাদপীঠে যে একটি কবিতা লিখিত আছে, উহা অনেকের লেখা হইতে গৃহীত হইয়াছিল এবং উহার শেষ দুইটি লাইন—

“ভক্তিভরে স্মরি তারে স্বদেশ-নিবাসী
স্থাপিলা এ মূর্ত্তি অতরল অশ্রুরাশি।”

উহা কবিবর নবীনচন্দ্রের লেখা।

মহাকবি তাঁর “কুরুক্ষেত্র” কাব্যে “বীরের শোক” নামক পঞ্চদশ সর্গে অভিমন্যুর মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন। চক্রব্যূহের মধ্যে ঘোরতর অধর্ম্মযুদ্ধে কৌরবের সাতজন মহারথী এক সঙ্গে অভিমন্যুকে সংহার করিলেন। এই কাপুরুষোচিত এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ঘৃণ্য-জনোচিত যুদ্ধে তখন—

“অধর্ম্ম! অধর্ম্ম! ঘোর”—ঘোর হাহাকার
জলধি কল্লোল মত উঠিল চৌদিকে
অধোমুখে সপ্তরথী ফিরিলা শিবিরে।”

তখন কুরুসৈন্যগণও অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মুমূর্ষু অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া শোকে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। মৃত্যুর ছায়া ধীরে ধীরে অভিমন্যুর নশ্বর দেহের উপর আসিয়া পড়িতেছে। মৃত্যুর ভীম নীরবতাও ক্রমে ঘনাইতেছে—সেই চরম মুহূর্ত্তে অভিমন্যু তাঁহার সারথীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"— সূত! ললাটে আমার
লিখ হৃদয়ের রক্তে, শরের জিহ্বায়
কৃষ্ণার্জ্জুন নাম, মধ্যে মাতা সুভদ্রার,
লিখ বুকে অনাথিনী নাম উত্তরার।"

সারথির লেখা শেষ হইয়া গেলে—

"————————— চাহি ঊর্দ্ধপানে
প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে গাহিতে গাহিতে
পুণ্যনাম চতুষ্টয় কহিতে কহিতে
"নারায়ণ—ধর্ম্মরাজ্য—পতিত উদ্ধার"
শুনিতে শুনিতে—"জয় অভিমন্যু জয়"
অনন্ত কৌরব কণ্ঠে, মুদিলা নয়ন
ঘুমাইলা শিশু যেন কোলে জননীর।"

কবিবর নবীনচন্দ্রও এইরূপ সংসার-রণাঙ্গনে আজীবন যুদ্ধ করিয়া জীবনসায়াহ্নে চট্টগ্রামে শ্যামশীতল শৈলমালা-পরিবেষ্টিত জননী-স্বরূপিণী মাতৃভূমির শান্তিময় ক্রোড়ে শেষ বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়কার কাগজে যতদূর দেখিয়াছিলাম মনে আছে, মৃত্যুর সময়ে তাঁর প্রিয় পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র পিতাকে "কৃষ্ণনাম" শোনাইয়াছিলেন। "গীতা" তাঁহার বক্ষের উপর রাখা হইয়াছিল। তাঁর অমৃতোপম গ্রন্থাবলী যাহাতে ভগবানের মুখ-নিঃসৃত গীতার ধর্ম্ম ভাষায় চিত্রিত করিয়াছিলেন সেই সমস্ত গ্রন্থাবলীও তাঁর শেষশয্যার পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছিল—

তাহা দেখিতে দেখিতে এবং পুত্রের মুখে অবিরত উচ্চারিত "কৃষ্ণনাম" শুনিতে শুনিতে—

"ঘুমাইলা শিশু যেন কোলে জননীর।"

এইরূপ মৃত্যুই ভক্ত হিন্দুর কাম্য। সুতরাং—

"শুনিতে শুনিতে যেন পুত্র-মুখে কৃষ্ণনাম
নবীনের হয় এই অপরাহ্ণ অবসান।"

নবীনচন্দ্রের এই শেষ আশা অতি সুন্দরভাবে সফল হইয়াছিল।

"প্রভাস" কাব্য

কবিবর নবীনচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-কালস্পর্শী মধ্যলীলা লইয়া "কুরুক্ষেত্র" কাব্য রচনা করিয়াছেন। "কুরুক্ষেত্রের" পর "প্রভাস" ভগবানের অন্তিম লীলা লইয়া রচিত—পূর্ব্বেই বলিয়াছি "রৈবতকে" যাহার উন্মেষ "কুরুক্ষেত্রে" যাহার বিকাশ এই "প্রভাসে" সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শেষ লীলা। "কুরুক্ষেত্রের" ভীষণ যুদ্ধের পর ভারতের অধিকাংশে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। তখন—

"ভারত ব্যাপিয়া শান্তি, ধর্ম্মের উত্থান
ভারত ব্যাপিয়া উঠিতেছে হরিনাম।
জরাসন্ধ শিশুপাল, অসংখ্য অবনীপাল,
অধর্ম্মের মহীরুহ নাহি দুর্যোধন,
আপনার পাপানলে ভস্ম পাপিগণ॥"

কিন্তু ঐ মহাযুদ্ধের পরও অশান্তি অনল পূর্ণভাবে নিবিয়াছিল না। সে সময় শ্রীকৃষ্ণের আপন বংশ, যদুবংশের দিকে যদি চাহিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদু-বংশীয়েরা পরস্পর হিংসায় অহঙ্কারে এবং শত্রুতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল—কেহ কাহাকেও মানিত না, কেহ কাহাকেও জানিত না, পাপকার্য্যে যাদবগণের মুখ অম্লান, লজ্জা কাহারও ছিল না,

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু কাহারও কিছুই জ্ঞান ছিল না ;—সে সময় তাহাদের—

"পরস্পরে কি বিদ্বেষ! ব্যভিচার কি অশেষ!
পিতা-পুত্র পতি-পত্নী পবিত্র বন্ধন
প্রবঞ্চনা ব্যভিচার করেছে ছেদন।

* * * * *

এ অনলে সুরাপান করিছে আহুতি দান
কি ভীষণ! নিরন্তর বিনা হৃষীকেশ
নর-নারী সুরাপানে মত্ত নির্ব্বিশেষ।"

সুতরাং যদু-বংশ ধ্বংসেরও আবশ্যক হইল এবং তাহার সময়ও আসিল। শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণী যাদবগণের এই মহা বিপত্তি নিবারণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিশ্বের হিত যাঁহার আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের মঙ্গল যাঁহার জীবনের ব্রত, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিচারমূঢ় নহেন, সুতরাং তিনি "অল্পস্য হেতোর্বহুঘাতী" হইতে ইচ্ছা করিলেন না। সত্যভামা এবং রুক্মিণীকে কহিলেন—

—রাজসূয় যজ্ঞক্ষেত্র
একবার শান্ত ভাবে কর দরশন
হায়! ভারতে সেই অশান্তি ভীষণ
রাজসূয় যজ্ঞস্থলে নিবারিনু কি কৌশলে
বলি দিয়া অশান্তির দুই অবতার
করিলাম শান্তির সে সাম্রাজ্য প্রচার
কিন্তু কি হইল বল? অধর্ম্মী প্রচণ্ডানল
জ্বালাইয়া কুরুক্ষেত্রে, পতঙ্গের মত
হইল ভস্মিত, করি শ্মশান ভারত।

কত যত্ন করিলাম জান তুমি অবিরাম
নিবারিতে কুরুক্ষেত্র হইল নিষ্ফল।
পূর্ণ অধর্ম্মের রাশি! ধ্বংস কর্ম্মফল
অধর্ম্মের যে উত্থান জ্বালাইল সে শ্মশান
সে অধর্ম্ম যাদবের অস্থি-মাংস গত
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল
কেমনে নিবারি—কেন নিবারিব আমি?
নহি যাদবের, আমি মানবের স্বামী।"

"নহি যাদবের আমি মানবের স্বামী"—ভগবানের মুখে এই মহাবাক্য শুনিয়া সত্যভামা ও রুক্মিণী শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের—

"—যোগস্থ মূর্ত্তি নীলমণিময়
দীপিতেছে দীপালোকে উর্দ্ধনেত্র দ্বয়।"

সেই মহা-মুহূর্ত্তে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন—

দূর ঝটিকার মত ওকি শব্দ অবিরত
আসিতেছে ভাসাইয়া আনন্দ উৎসব—
মানবের হাহাকার, পক্ষী কলরব
কাঁপিতেছে ঘন ঘন
ধরা ক্ষুদ্র দোলা সম
রুক্মিণী ও সত্যভামা পতিপদতলে
পড়িলেন শয্যাভ্রষ্টা প্রকম্পন বলে।
পতনে অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা
ধরিয়া বিস্মিতা ভীতা
পতির চরণ দ্বয়, উঠিল কাঁদিয়া
সমুদ্র গর্জ্জন তাহা নিল ভাসাইয়া

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু কাহারো কিছুই জ্ঞান ছিল না,—সে সময় তাহাদের—

"পরস্পরে কি বিদ্বেষ ; ব্যভিচার কি অশেষ !
পিতাপুত্র পতিপত্নী পবিত্র বন্ধন
প্রবঞ্চনা ব্যভিচার করেছে ছেদন।

* * * *

এ অনলে সুরাপান করিছে আহুতি দান
কি ভীষণ ! নিরন্তর বিনা হৃষীকেশ
নর-নারী সুরাপানে মত্ত নির্বিশেষ।"

সুতরাং যদুবংশ ধ্বংসেরও আবশ্যক হইল এবং তাহার সময়ও আসিল। শ্রীকৃষ্ণের মহিষী রুক্মিণী যাদবগণের এই মহাবিপত্তি নিবারণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিশ্বের হিত যাঁহার আকাংক্ষা, বিশ্বের মঙ্গল যাঁহার জীবনের ব্রত, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিকারমূঢ় নহেন ; সুতরাং তিনি "অল্পস্য হেতোর্বহুঘাতী" হইতে ইচ্ছা করিলেন না।

জ্ঞানের আধার মহামুনি বেদব্যাসের, বলের আধার পাণ্ডব-শক্তির এবং সর্বোপরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহা-মহিমায় খণ্ড ভারতে যে এক মহাভারত স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার শীতল ছায়ায় ভারতবর্ষ বহুদিন সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভারতের জ্ঞান, ভারতের বিজ্ঞান, ভারতের সংস্কৃতি বহুদিন ধরিয়া জগতের সভ্যতা-ক্ষেত্রে এবং জগতের বহু জাতির সম্মুখে নূতন নূতন আলোক দান করিয়াছিল। তাই বলিতেছি, হিন্দুর চক্ষে নবীনচন্দ্রের "রৈবতক," "কুরুক্ষেত্র" এবং "প্রভাস" যে কত পবিত্র তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না—এরূপ মহাকাব্য বাংলায় আর হইবে কিনা সন্দেহ। মহাকবি জীবনের প্রায় অপরাহ্ণে

এই কৃষ্ণ-লীলা কীর্তন করিয়া "প্রভাস" কাব্যের শেষ সর্গের উপসংহারে প্রাণের আবেগে তাঁর মানস কন্যা শৈলজাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন—

"চতুর্দশ বর্ষ মাগো ! এরূপে বসিয়া ধ্যানে
দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে
পাইয়াছি শোকে শান্তি, পাইয়াছি দুঃখে সুখ,
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র, প্রেমে ভরিয়াছে বুক।
ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর,
বহিয়াছি এ জীবন আশা ও নিরাশার
গীত শেষ অপরাহ্ণে. সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস তীরে
সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদ তরী
এই তীরে সন্ধ্যা ; উষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।"

কবি নবীনচন্দ্রের উপর কৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব কবিকে যে এক অপার্থিব প্রেরণা দান করিয়াছিল, সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কবিবর তাঁহার লিখিত "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" এবং "প্রভাস"এর প্রতি ছত্রে যে মাধুর্য বর্ষণ করিয়াছেন উহা চিরদিন বঙ্গীয় পাঠকগণকে তৃপ্তি দান করিবে, সন্দেহ নাই।

(৭)

অমিতাভ, খৃষ্ট এবং অমৃতাভ কাব্য

কবিবর নবীনচন্দ্রের তার পরের মহাকাব্য, নারায়ণের অন্যতম লীলা-মাহাত্ম্য "অমিতাভ"।—সকলেই জানেন ভগবান বুদ্ধদেবের অন্যতম নাম "অমিতাভ"—যাঁহার অমিত প্রভায় সার্ধ দুই সহস্র বৎসর, কালবক্ষ

উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে এবং সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা পর্যন্ত যাঁহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় মহাকবি Edwin Arnold তাঁহার Light of Asia নামক মহাকাব্যে যে বুদ্ধদেবের নাম পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে প্রচারিত করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, সেই ভগবান্ বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিয়া মহাকবি নবীনচন্দ্র তাঁর এই "অমিতাভ" নামক মহাকাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। ১৩০২ সালে এই কাব্য প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র "অমিতাভ"এ বুদ্ধদেবকে অতিমানুষ ভাবে চিত্রিত না করিয়া মানুষভাবাপন্ন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন—কৃষ্ণচরিত্রে, শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন perfect man ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, "অমিতাভ"এ নবীনচন্দ্র ভগবান বুদ্ধদেবকে সেই মত আদর্শ মানবরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। "অমিতাভ"এ নবীনচন্দ্র আরো বলিয়াছেন, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, হিন্দু-ধর্মে ও বৌদ্ধ-ধর্মে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। বৌদ্ধধর্ম—কর্মবাদ ও জন্মান্তর-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা হিন্দুধর্মেরও মূল তত্ত্ব। তবে হিন্দু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, বৌদ্ধধর্ম এ সম্বন্ধে নীরব। কর্মফলের জন্য জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় এবং আমাদের সর্ববিধ দুঃখ সেই জন্য—ইহা হিন্দুরও মত,— তবে প্রভেদ এই যে, হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, ভগবানের কৃপায় তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের মতে কেবল সুকর্মের দ্বারা কুকর্মের ফলক্ষয় হইলে আর পুনর্জন্মের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না এবং তজ্জনিত দুঃখেরও "নির্বাণ" হয়। নবীনচন্দ্র আরো বলিয়াছেন, যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে বুদ্ধদেব ভগবৎ-কৃপার কথা কিছুই না বলায়, বৌদ্ধেরা ভাবেন বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর-বাদ নাই।

নবীনচন্দ্র তাঁহার "অমিতাভ" কাব্যে এই সমস্ত তত্ত্ব-কথার আলোচনা করিয়াছেন—দুই ধর্মের এই সমস্ত আপাত-বিভিন্ন অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্য

দান করিয়াছেন। বিশেষতঃ বুদ্ধদেব হিন্দুর দশ অবতারের মধ্যে নবম অবতার। হিন্দুধর্ম একটী সার্বভৌমিক ধর্ম—বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের একটী অন্যতম মত মাত্র।

"অমিতাভ"এর ১৯ সর্গে মহাকবি ভগবান্ বুদ্ধদেবের মহানির্বাণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সর্গ পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, আমরা যেন সার্ধ দ্বি-সহস্র বৎসর পূর্বেকার কোন এক অতি পবিত্র অপার্থিব পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা যেন মানস-চক্ষে দেখিতেছি—এক নীরব বসন্তের পূর্ণিমা রজনীতে কুশীনগরের নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র ভাসিতেছেন। সিদ্ধকাম ভগবান্ তথাগত বুদ্ধদেব শালবন মধ্যে যোগাসনে বসিয়া শিষ্যগণকে তাঁহার নির্বাণের অমূল্য উপদেশসমূহ দিতেছেন। ভগবান্ বুদ্ধের ঐ মহাবাণীসমূহ পাপ-তাপ এবং হিংসা-দ্বেষ পূর্ণ এই ধরাতলে চিরকাল অন্ধকারে আলোক-রশ্মির মত প্রতিভাত হইবে।—উপদেশ দিতে দিতে—

—"ফুরাইল শেষ কথা, ধীরে বুদ্ধদেব
হইলা নীরব—ধীরে মুদিলা নয়ন।
ভিক্ষুগণ এক কণ্ঠে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত
গাইলা, সে মহাবন করিয়া ধ্বনিত—
বুদ্ধো মে শরণম্
ধর্মো মে শরণম্
সঙ্ঘো মে শরণম্
মহা কথা, মহা কণ্ঠ, শান্ত সুগভীর
নৈশ নীরবতা সহ মিশাইলা ধীরে,
মিশাইলা ধীরে পুণ্য জ্যোৎস্নার সহ
নির্মল উজ্জ্বলতর পূর্ণ জ্ঞানালোক ;—
সমাধিস্থ বুদ্ধদেব লভিলা নির্বাণ।

* * * *

অস্তে গেলা পূর্ণচন্দ্র মিতাভ নশ্বর
অস্তে গেলা আলোকিয়া অশীতি বৎসর
পূর্ণচন্দ্র অমিতাভ ধর্ম জগতের।

*　　*　　*　　*

অনন্ত মর্মর-কাব্যে সেই দেবলীলা
ভারতের অঙ্কে অঙ্কে হলো প্রতিষ্ঠিত
মানবের মহাতীর্থ জগত বিস্ময়।"
এইখানেই "অমিতাভ" কাব্যের শেষ হইল।

মানবজাতি প্রায় ভ্রান্ত পথেরই পথিক। সার্বভৌম এই হিন্দুধর্মের শাখা বৌদ্ধ ধর্মও ক্রমে ঘোরতর নিরীশ্বরত্ব ও জড়ত্ব আনিল। স্বেচ্ছাচার ও শূন্যবাদে ভারত-ভূমি পরিপূর্ণ হইল—অতি কুৎসিতস্বভাব, বৌদ্ধ কাপালিক-গণ ভারতের বহুস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া মদ্য, মাংস এবং নারী উপভোগের দ্বারা অশেষ অকল্যাণকর সাধনায় নিয়োজিত থাকিত। সুতরাং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানবাদ প্রচার দ্বারা বৌদ্ধধর্মের জড়ত্ব ঘুচাইলেন—কালে আবার তাহাও "মায়াবাদের কাষ্ঠবৎ কঠোরতায়" পরিণত হইল—সুতরাং ইতিহাসের আবার পুনরাবৃত্তির আবশ্যক হইল—যিনি দুষ্কৃতের বিনাশ, সাধুদের পরিত্রাণ এবং প্রকৃত ধর্মস্থাপন করিয়া আসিতেছেন—পুণ্যভূমি ভারতে আবার তাঁহার আবির্ভাব হওয়ার প্রয়োজন হইল, তাই ভগবান্ চৈতন্যদেব নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপথ প্রসারিত করতঃ বিশ্বব্যাপি প্রেমে ধর্মের সেই কঠোরতা ভাসাইয়া দিয়া প্রেমের বন্যায় সমগ্র বাংলা এবং নীলাচল প্লাবিত করিয়া দিলেন। নব ধর্মের বেদীমূলে সমগ্র ভারত মস্তক অবনত করিল। মানবের অন্ধত্ব, জড়ত্ব এবং হিংসা-দ্বেষ সমস্তই মুছিয়া গেল—মিহাকব নবীনচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চট্টগ্রামের সেই নিভৃত

শৈল-সানুদেশে বসিয়া পরিণত বয়সে প্রেমের অবতার চৈতন্যদেবের অপূর্ব লীলা-মাধুরীও তাঁর "অমৃতাভ" নামক কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়া তাঁর শেষ আশা পূর্ণ করিয়াছেন। "অমৃতাভ" কাব্য লিখিবার পূর্বে ভগবানের অন্যতম অবতার মহাপুরুষ যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধেও কাব্য লিখিয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ রোমানদিগের অধিকারে জগতে এক বিরাট বৈষম্য দেখা দিয়াছিল। একদিকে রোমের ভোগলালসাপূর্ণ সাম্রাজ্য-বাদের বিপুল প্রয়াস, অন্যদিকে সেই সাম্রাজ্য-লিপ্সা পরিপূরণের জন্য জনগণের উপর ভীষণ শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও অবিচার; সেই হৃত-মনুষ্যত্ব এবং হৃত-বৈভব গণশক্তি, রোমের বর্বর-যুগোচিত শাসন ও নৃশংসতায় মাথা তুলিতে পারে নাই—সুতরাং ভগবানের আসন টলিল—সেই যুগ-সন্ধি-ক্ষণের মহামুহূর্তে ভগবান্ যীশুখৃষ্ট আমাদের এই এশিয়াতেই জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে এক মহাসাম্যের বাণী ঘোষণা করিলেন। ক্রমে সেই সাম্যবাদ জগতে যে এক গণ-জাগরণ আনিয়া দিল, তাহাতে রোমান সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই সাম্যাবতার ভগবান্ যীশুখৃষ্টের পবিত্র জীবনী লইয়া কাব্য রচনা করা, মহাকবি নবীনচন্দ্রের উপর কৃষ্ণচরিত্র যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারই অন্যতম ফল। কবি কখনও দেশ, কাল ও পাত্রের অপেক্ষা রাখেন না—কবির লেখনী সর্বদাই মুক্ত। বিহঙ্গমের মত বিশ্বজগতের যে কোন স্থানে কবি পরিভ্রমণ করেন। কবির কল্পনা-রাজ্য সীমাহীন—সীমা হইতে সীমান্তরে কবির মনোরাজ্য বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। সমগ্র জগত আজ কি বিদ্বেষপূর্ণ! অন্ধ ও জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন মানব আমরা আজ কি ভ্রান্তপথেই পরিচালিত হইতেছি। নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—"সত্যই ধর্মের প্রাণ, মনুষ্যত্বই ধর্মের চরম লক্ষ্য এবং মনস্বী মানব মাত্রই ইহার শিক্ষক।"—সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান্ তথাগত—যিনি নির্বাণরূপ পরম সত্যের জ্ঞানলাভ করিয়া

ছিলেন, সেই মহাযোগী সর্বস্বত্যাগী রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, সাম্যবাদের পবিত্র প্রতীক যীশুখৃষ্ট, হজরত্ মহম্মদ এবং শ্রীচৈতন্যদেব সকলেই ভগবানের অবতার স্বরূপে সকলের কাছে, সর্বক..লের সর্বসময়ে পূজনীয় এবং নমস্য, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ভ্রান্তপথের পথিক আমরা—আজ আমরা পরম সত্যসমূহ ভুলিয়া গিয়া ধর্মের কতকগুলি বহিরাবরণ লইয়া পরস্পর হিংসা এবং বিদ্বেষে নররক্তে ধরিত্রীকে প্লাবিত এবং কলুষিত করিতেছি। আজ সমগ্র বিশ্বজগত অস্থির, অধর্মের ভয়াবহ উত্থানে, সমস্ত জগতে আজ ঘোরতর অশান্তি। জ্ঞানপথ, কর্মপথ এবং ভক্তিপথ—গীতার এই তিনটী নির্দিষ্ট পথ হইতেই আজ আমরা ভ্রষ্ট। আজ আমাদের সম্মুখে পূর্বেও বহু বিপ্লব-তরঙ্গ গিয়াছে। হিন্দু জাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতি এই তরঙ্গাভিঘাতে জীবিত থাকিতে পারে নাই। রোম নাই, গ্রীস নাই, তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন ভারত আছে। সেই রোম জাতি, সেই গ্রীক জাতি নাই—কিন্তু তদপেক্ষা পুরাতন হিন্দু জাতি কঙ্কাল অবশিষ্ট হইয়া এখনও জীবিত আছে। ভারত পড়ে, মরে না, হিন্দু জাতি বলহীন, জীব-হীন হয় না। কর্মহীন হয়, ধর্মহীন হয় না—ধর্মের সঙ্গে কর্মের যোগ হইলে আবার মাথা তুলিয়া উঠিবে।"

(৮)

উপসংহার

আমরা এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম। আজ হইতে প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে আমাদিগের এই সুজলা সুফলা মলয়জ-সমীরণ-শীতলা বঙ্গদেশের প্রান্তস্থিত সাগর-সমীরণ-পরিসেবিত সুদূর চট্টগ্রামে যে মহাকবি জন্ম গ্রহণ করিয়া উত্তর কালে আমাদের এই জননীস্বরূপিণী বঙ্গ-ভাষাকে নানা

অলঙ্কারে ভূষিতা করিয়া গিয়াছেন, যিনি সেই পরম-পুরুষ এবং মহা-যোগেশ্বর, সেই অব্যয় এবং সনাতন ধর্মের রক্ষক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মানবীয় চরিত্র সুললিত ছন্দোময়ী ভাষায় কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়া বাংলার পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই মহাকবির জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার স্বর্গগত পূত আত্মার প্রতি সহস্র প্রণতি জানাইতেছি। যে মহাকবি নবীনচন্দ্র মধুর এবং উদাত্ত স্বরে বঙ্গ-বীণা বাজাইয়া "রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস" প্রভৃতি কাব্যে এক অতি মনোহর এবং পবিত্র সংগীত গান করিয়া অমর হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করি—কারণ তাঁহার এই সুমধুর এবং সুপবিত্র কাব্যসমূহ চিরদিনের জন্য—

"—হইবে ঘোষিত
অনন্ত কালের কণ্ঠে প্রবাদের মত,
মানবের কর্মপথ করি' আলোকিত
মানব-জগতে রবে হিমাদ্রির মত।
বিরাট গগন-স্পর্শী মূরতি যাঁহার
তাঁর পদ-তীর্থে নাহি প্রণমিয়া হায়
নমিব মানব আমি চরণে কাহার ?"

———

রৈবতক কাব্য

৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত

সমালোচনা*

(১)

নিবিড় নৈশ অন্ধকার সরাইয়া, উষান্তে যখন প্রাচীমূলে অরুণ রবি সমুদিত হয়, সহৃদয় প্রকৃতির উপাসক, আত্মবিস্মৃতের মত সেই দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মনে হয়, বুঝি জ্যোতিঃপদার্থের এই চরমোৎকর্ষ; এই রবিই যে আলোকসমুচ্চয়ে দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া মধ্যাহ্নমার্তণ্ডরূপে তরল অনল ঢালিয়া, দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিবে, ইহা সে কল্পনাতেও আনিতে পারে না। কথাটা বোধহয় আর একরকমে বলিলে স্পষ্টতর হইবে। সন্ধ্যার আলোক-আঁধার ছায়ায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুক তারার বিকাশ দেখিয়া, কে অচিরভাবী পূর্ণশশধরের প্রশান্ত কবিতাপূর্ণ আবেশময় সুধারাশির কথা ভাবিবার অবসর পায়? নবীনবাবু, পর পর তিন খানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছেন। প্রথম 'পলাশির যুদ্ধ', তারপর 'রঙ্গমতী', শেষ এই 'রৈবতক'।

'পলাশির যুদ্ধ' পড়িয়া কাহারও আর সন্দেহ ছিল না যে, একখণ্ড অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইয়াছে। কেহ হয়ত ইহাকে ধূমকেতুর অশিব জ্যোতিঃ ভাবিয়া, কর দিয়া নয়ন আবৃত রাখিয়াছিল; কেহ বা ইহাকে

> "নিশার গগন হ'তে
> ক্ষরিত আলোক মত
> বিচ্যুত তারার;—"

---

* ১২৯৭ সালের "সাহিত্য" হতে লেখকের সুযোগ্য পুত্রগণের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

ভাবিয়া, কথন ভূতল স্পর্শ করে, এই আশায় চাহিয়াছিল। কিন্তু কয় জন ভাবিয়াছিল যে, এই আলোকমণ্ডল কালে গগন ছাইয়া, সঞ্জীবনী সুধারাশি বর্ষণ করিয়া, বাঙ্গালীর ক্ষুণ্ণহৃদয়ে আশা, উৎসাহ ও সজীবতার সঞ্চার করিবে?

শুনিয়াছি, বাঙ্গালী পাঠকের কাছে 'রৈবতক'এর বড় আদর হয় নাই। কথাটা সত্য কিনা জানি না; যদি সত্য হয়, ইহা আমাদের গগনস্পর্শী আত্মাভিমানের বড় পরিপোষক নহে। শুনিলাম, বাঙ্গালীর বড় দোষ নাই। গ্রন্থের নীরসতাই ইহার একমাত্র কারণ। হরি! হরি! আর দিন কয়েকে শুনিব যে, জীবন-মরণের কথা আছে বলিয়া, দার্শনিকতা সমাজ, ধর্মনীতিতত্ত্বের কবিতাময়ী আলোচনা আছে বলিয়া, গেটের ফাউষ্ট (Faust), ও সেক্ষপীয়রের হ্যামলেট (Hamlet) ও নীরস, অমধুর, অপাঠ্য।

এই কথায় আমার একটী গল্প মনে পড়িল। গল্পটী প্রাচীন কিন্তু বড় উপদেশপূর্ণ, বোধহয় এখানে বলিলে বড় অসংলগ্ন হইবে না।

একদিন এক ভুল্লিরপত্নী নিবিড় বনে করিকুম্ভভ্রষ্ট রক্তাক্ত এক অপূর্ব গজমুক্তা দেখিতে পাইল। দেখিয়া বদরিফল ভ্রমে সহর্ষে মুখের কাছে উঠাইয়া ভাবিল, একি! এ যে উজ্জ্বল, কঠিন, নিটোল, শ্বেত! এ কি পদার্থ? এ-ত বদরী নহে; ছি! ছি! ছি!

বাঙ্গালীর কাছে রৈবতকের নীরসতার কথা যদি ছায়া মাত্রে সত্য হয়, তাঁহাকে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহার জিহ্বার রসাস্বাদ শক্তির প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি আবশ্যক; কিংবা হয়ত, অম্ল-কটু-কষায় প্রভৃতি রসের অযথা আস্বাদনে, তাঁহার রসনার বিকৃতি ঘটিয়াছে।

এ জগতের সর্বত্রই বিবর্তনবাদের সত্যতা অনুমিত হয়। জড়ে ও চেতনে, স্থাবরে ও জঙ্গমে, কীটে, পতঙ্গে, চতুষ্পদে, দ্বিপদে, সর্বত্রই

এই তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। বাহ্য জগতের মত, অন্তর্জগতেও একথা খাটে। কবির প্রতিভাও এই বিশ্বব্যাপী নিয়মের অনুবর্তী। কবিসৃষ্টিতেই এই ক্রমের ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ, প্রথমে যাহা সূক্ষ্ম বীজরূপে অন্তর্নিহিত থাকে, কালে তাহাই পরিপুষ্ট হইয়া মহামহীরুহে পরিণত হয়। উর্বশীর অদর্শনে উন্মাদগ্রস্ত রাজা পুরুরবার স্যন্দমান মেঘের করুণ আমন্ত্রণে, আমরা কান্তাবিরহ-বিধুর শাপভ্রষ্ট নির্বাসিত যক্ষের হৃদয়ভেদী আর্তনাদের পূর্বস্বর শুনিতে পাই। এইরূপ 'রঙ্গমতী' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয়টি ছত্রে, সমগ্র 'রৈবতক' মহাকাব্যের বীজাঙ্কুর দেখিতে পাই।

অন্তর বিগ্রহে বৎস, ডুবিছে ভারত।
ইতিহাসে প্রতি-ছত্রে এই বহ্নিশিখা
জ্বলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নিশিখা
দেবচক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথম।
মহাজ্ঞানী নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
ভস্মি উপরাজ্য, গ্রাম, বিচিত্র কৌশলে
জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিতপ্রবাহে
নিবিলে সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
কৌরবের একছত্র হইল স্থাপন।

নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদেবের এই মহাকীর্তি-প্রসঙ্গ লইয়া 'রৈবতক' রচিত। খণ্ড ভারতে, কি উদারতা, পরার্থ-পরতা, অলৌকিক কৌশল, প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া, এক মহাভারত স্থাপন করেন, তাহাই এ মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এ মহাপাদপের অঙ্কুর মাত্র রোপিত হইয়াছে; সুভদ্রার বিবাহই এই অঙ্কুর।

আপাততঃ ভদ্রার পরিণয়েই কাব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের অনেক চরিত্র এখনও অসম্পূর্ণ। অনেক সূত্র এখনও বিপর্যস্ত রহিয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক এই মহাগীতির উত্তর তান শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। কবি কি তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন না? কবি কি তাঁহার ধীরললিত বীণার ঝঙ্কার তুলিয়া বাসুদেবের 'অক্ষয় কীর্তির গান অমৃত সমান' সম্পূর্ণ করিবেন না?

বলিয়াছি, সুভদ্রার বিবাহে 'রৈবতক' পরিসমাপ্ত হইয়াছে; এই ঘটনাই গ্রন্থের উদ্দিষ্ট। এই সাগর লক্ষ্য করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা স্রোত গ্রন্থ-অঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভদ্রার বিবাহ ঐতিহাসিক ঘটনা। মহাভারতেই আমরা ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাভারতকার দু'কথায় এ প্রসঙ্গ সারিয়াছেন। সুভদ্রাহরণ পর্বাধ্যায়, এই মহাগ্রন্থের এক অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। ইহাতে আমরা এই ক'টি কথা পাই।

অর্জুন তীর্থভ্রমণে প্রভাসে উপনীত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া রৈবতকে আনিলেন। তথায় সর্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রাকে দেখিয়া, অর্জুনের অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া, মৃগয়াচ্ছলে দারুকের রথে আরূঢ় হইয়া, অর্জুন রৈবতকবিহারিণী ভদ্রাকে, বল-পূর্বক গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যাদবেরা (বিশেষতঃ বলরাম) শুনিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, কৃষ্ণ অনেক বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন, এবং সাদরে অর্জুনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া ভদ্রার সহিত যথাবিধি পরিণয় সংঘটন করিলেন। এই কয়টি কথা, কাব্যের প্রচুর উপাদান নহে। ইহা সরল ইতিহাসের সহজ জল্পনা।

বলা বাহুল্য, কবি মহাভারতের ঠিক অনুসরণ করেন নাই। কেই বা করিয়াছেন? কালিদাস শকুন্তলায়, ভারবি কিরাতার্জুনীয়ে, মাঘ শিশুপালবধে, ভবভূতি উত্তরচরিতে, কেহই আদিকবির ঠিক পথানুসারী নহেন। তবে কি এই অপরিসর ভিত্তির উপর রৈবতক দেবপ্রাসাদ স্থাপিত? এই অগভীর মূল অবলম্বন করিয়া রৈবতক মহাবৃক্ষ পরিবর্ধিত? ঠিক তাহা নহে। কল্পনার প্রিয়পুত্র পৌরাণিকদিগের যুগবাহী কথা-পরম্পরায় ইহা পুষ্টকলেবর হইয়া, নগ্নাংশে বিচিত্র অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিল। শেষ সুকবি কাশীদাসের মহাভারতে ইহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ কাব্যোপযোগী হইয়াছিল। আমি সঙ্ক্ষেপে কাশীদাসী মহাভারতান্তর্গত সুভদ্রাহরণ কাহিনী বিবৃত করিব। কোথায় আমাদের কবি কাশীদাসের অনুগামী হইয়াছেন, কোথায়ই বা বিচিত্র কল্পনার সাহায্যে তাঁহাকে বহুদূরে রাখিয়াছেন—এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিলে, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিবেন।

সময়ভঙ্গ পাপের প্রায়শ্চিত্তে তীর্থভ্রমণ কালে অর্জুন প্রভাসে উপনীত হইলেন। কৃষ্ণ শুনিয়া সাদর আমন্ত্রণে তাঁহাকে রৈবতকে লইয়া গেলেন। সেথা যাদব মহোৎসবে ভদ্রার্জুনের সাক্ষাৎকার হইল। সুভদ্রা রূপে অনুপমা; তায় আবার এই তার নবীন যৌবন। অর্জুন ঈষৎ চঞ্চল হইলেন। কিন্তু ভদ্রা একেবারেই অনঙ্গশরে জরজর। সত্যভামার কাছে বিস্তর কাঁদাকাটি আরম্ভ করিলেন। সত্যভামা অশেষ প্রকারে ননন্দার মন ফিরাইতে প্রযত্ন করিলেও, কিছুতেই সেই একটানা ভাঁটার জল বাগ মানিল না।

ভদ্রা কহে, যত কহ নাহি করি জ্ঞান।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা বিদ্যমান॥

* * * * *

বিনা ধনঞ্জয় আর নাহি দেখি আন ॥
আজি যদি ধনঞ্জয় আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥

সত্যভামা অনন্যোপায়; সেই রাত্রেই মিলন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু অর্জুন বাঁকিয়া বসিলেন।

বলভদ্র জনার্দন যদুকুল পতি।
তাঁহার আজ্ঞায় আমি লইব যাদবী ॥

সত্যভামা নিরুপায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রতিদেবীর অন্বেষণে চলিলেন। রতিদেবী তন্ত্রে মন্ত্রে পারদর্শিনী; তিনি বলিলেন,—শুধু রূপের কর্ম নয়, ছিটা-ফোঁটার আবশ্যক আছে।

এত বলি সিন্দূর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি' দিল দুই নয়নে কজ্জলে ॥

এই মোহিনীবেশে ভদ্রা অর্জুনের কক্ষে গিয়া উপস্থিত। পার্থ মারিতে উদ্যত; কিন্তু—

সীঁতায় সিন্দূর তার নয়নে কজ্জল।
দেখিয়া পড়েন পার্থ হইয়া বিহ্বল ॥

পৃথিবীর যেন অর্ধ আবর্তন ঘটিল। দিবা যেন রজনী হইল। অর্জুন অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। শেষ সত্যভামা উভয়ের গান্ধর্ব-বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন।

পরদিন যাদব-সভায় বাসুদেব পার্থের গুণ কীর্তন করিয়া, তাঁহার সহিত ভদ্রার বিবাহ প্রস্তাব করিলেন। অন্য সকলের অভিমত হইল। কিন্তু বলদেব একেবারে চটিয়া আগুন। তাঁহার মতে দুর্যোধনই ভদ্রার অনুরূপ পতি; তিনি একেবারে বর আনিতে হস্তিনায় দূত পাঠাইলেন।

মহাসঙ্কট। অনেকে অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই বলরামের মন ফিরিল না। অবশেষে কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে, অর্জুন মৃগয়াব্যপদেশে দারুকের রথে চড়িয়া সুভদ্রাহরণ করুন।

পরামর্শ মত কাজ হইল। পর দিন অর্জুন

ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইলা রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ পথে॥

শুনিয়া বলদেব অগ্নিশর্মা। যদুবীরগণ ক্রোধভরে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মহারণে সম্মুখীন হইলেন। দারুক রথ চালাইতে অস্বীকৃত হইলে, সুভদ্রা আপনি অশ্বরশ্মি লইয়া অপূর্ব কৌশলে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনেক রক্তপাত, অনেক লোকক্ষয় হইল।

কোটী কোটী রথী পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর।
রক্তে নদী বহে সবে রক্তেতে সাঁতারে॥

বলদেব আপনি রণে যাইতে উদ্যত। কৃষ্ণ অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। শেষ অর্জুনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া, যথাবিধি শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

কাশীদাসী মহাভারতে ভদ্রার বিবাহকাহিনী এই আকার ধারণ করিয়াছে। নবীন বাবু ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কি অপূর্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা দেখানই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রৈবতকের অধিকাংশ চরিত্রই পুরাতন। কৃষ্ণ, অর্জুন, ব্যাস, দুর্বাসা, বাসুকি, রুক্মিণী, সত্যভামা, সুভদ্রা, এ নাম আজ তিন সহস্র বৎসর, হিন্দুমাত্রেরই কর্ণে ধ্বনিত হইয়া অজস্র সুধারাশি বর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে ইহারা নিতান্ত পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। এই পুরাতনে নূতন সমাবেশ করিয়া, এই বাসি ফুলে নূতন মালা গাঁথিয়া কবি যে

অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন,—যে অপূর্ব কৃষ্ণ, অপূর্ব অর্জুন, অপূর্ব দুর্বাসা, অপূর্ব বাসুকি, বিশেষতঃ যে অপূর্ব সুভদ্রার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। শুধু ইহাই নহে। জরৎকারু, শৈলজা, সুলোচনা, ইহারা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি, কিন্তু কেমন সুন্দর, কেমন স্বাভাবিক, কেমন কাব্যোপযোগী, কেমন সময়ের অনুরূপ! ইহারা মিলিয়া এক অপূর্ব জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা শুধু ভারতবর্ষেই সম্ভব। কিন্তু তাহা বলিয়া চিত্র কাল্পনিক নহে।

কবির কল্পনা এক অপূর্ব শক্তি। এই শক্তিপ্রভাবে স্বর্গ-নরকের অদৃষ্ট বস্তুও কবির নয়নে প্রতিবিম্বিত হয়। অতীতের আঁধার ছবিও ভবিষ্যতের আবছায়া চিত্র তাঁহার কল্পনায় প্রতিভাত হয়। কবি, প্রতিভার আলোকে ভূত ইতিহাসের অন্ধকার ছায়া আলোকিত করেন। অদ্ভুত প্রতিভাবলে পুরাতত্ত্ববিদের বহু গবেষণায় আবিষ্কৃত ইতিহাস-ছবি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন।

নবীব বাবু তাৎকালিক ভারতের যে অপূর্ব চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে যে কত আলোচনা, কত চিন্তাশক্তি, কত পুরাতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা মহাভারত ভাসা-ভাসা রকমে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রথম দৃষ্টিতে এ চিত্র কাল্পনিক ও অযথার্থ বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, সমগ্র মহাভারত এক সময়ে বা একজনের রচিত নহে।

ইহার অন্যূন তিনটি স্তর * আছে, প্রথম স্তর অতি প্রাচীন; দ্বিতীয় স্তর পুরাতন; তৃতীয় স্তর বহু শতাব্দী ধরিয়া ও বহু কবির রচনায় গঠিত। কবি প্রধানতঃ প্রথম দুই স্তর অবলম্বন করিয়া, এই চিত্র আঁকিয়াছেন।

---

* এই কথা কিছুদিন Lassen জার্মানিতে ও বঙ্কিমবাবু এ দেশে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

আর্য্যসমাজ বেদের শৈশব ও রামায়ণের কৈশোর ছাড়াইয়া, মহাভারতের যৌবনে উপনীত হইয়াছে। সে সরল ক্রিয়াবহুল বৈদিক ধর্ম, কোথাও উপনিষদের জ্ঞানমার্গে সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া, কোথায়ও বা হিংসাসংকুল পৈশাচিক যজ্ঞে বিকৃত হইয়া, রূপান্তরিত হইয়াছে। বৈদিক সমাজের আর্য্য ও দস্যুভেদ এখন মনুর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে পরিণত হইয়াছে। অপূর্ব প্রতিভাবলে এ সমাজের শীর্ষস্থানে ব্রাহ্মণ,—তাঁহাদেরই পূর্ণ আধিপত্য।

তাঁহারাই ধর্ম ও নীতিবেত্তা, আবার তাঁহারাই ধর্ম-প্রণেতা। এ আধিপত্য একদিনে বা একেবারে হয় নাই। পরশুরামের ধরণীনিক্ষত্রিয়-করণে, বোধ হয়, আধিপত্যের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের আভাস পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ প্রভু, অন্য তিন জাতি তাঁহাদের পদানত। অনার্য্য দস্যু আর্য্য সমাজভুক্ত হইয়া শূদ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কবি এইরূপে তাহাদের অবস্থার চিত্র † আঁকিয়াছেন।

> তাহাদের শূদ্র নাম ; দাসত্ব ব্যবসা।
> অর্দ্ধাহার, অনাহার, জীবন-নিয়ম,
> পরমার্থ আর্যদের চরণ লেহন !
> পদ-চিহ্ন পুরস্কার। দেখিবে যখন
> পবিত্র আর্যের মূর্তি, যাইবে সরিয়া
> শত হস্ত ; প্রণমিবে ধূলি বিলুণ্ঠিয়া।
> কেবল সঞ্চিবে অর্থ, ধরিবে জীবন
> আর্যের সেবার তরে। তিরস্কার ভাষা ;
> পদাঘাত সদাচার ; করে হত্যা যদি
> আর্য কেহ, নরহত্যা নহে কদাচন !

---

† আমার বিশ্বাস, দুর্দান্ত অর্ধসভ্য অনার্য জাতির বিষদন্ত উৎপাটনের জন্য, এ কঠোর দণ্ডবিধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কালে যে ইহার অপচার ঘটিয়াছিল, সে সন্দেহ নাই।

বলা বাহুল্য, জেতৃজাতির এই অত্যাচার বিজিতের অস্থিমজ্জা নিষ্পেষিত করিতেছিল। রাজ্যচ্যুত, বিতাড়িত, পদদলিত, অনার্য জাতি হৃদয়ের অন্তস্তলে যে বিদ্বেষ, যে ঈর্ষ্যা, যে প্রতিহিংসাবহ্নি এতদিন গোপনে পোষণ করিতেছিল, আর্যগৃহভেদে সুযোগ পাইয়া, এখন সেই বহ্নি সর্বগ্রাসী বৈশ্বানরে পরিণত হইতেছিল।

এই গৃহভেদ-চিত্রও কবি বিচিত্র তুলিতে আঁকিয়াছেন। আর্যরাজ্য আর দেবনদী সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর অন্তর্বর্তী ক্ষুদ্র উপনিবেশ নহে। পশ্চিমে সিন্ধুপারে গান্ধারে, সদানীরার পূর্বে অঙ্গে ও কলিঙ্গে, উত্তরে অভ্রভেদী হিমাচল-চূড়ায় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি নামাইয়া কন্যা-কুমারিকায় আর্যবৈজয়ন্তী আকাশ স্পর্দ্ধা করিয়া উড্ডীন হইয়াছে। সর্বত্রই আর্যনীতি, আর্যধর্ম ও আর্যসমাজ প্রবর্তিত হইয়াছে। চারিদিকে অনার্যশক্তির নিপীড়নে, আর্যজাতির উৎসাহ, আশা ও উদ্দেশ্যের যে একতাবন্ধন ছিল, রাজ্যভেদ, গৃহভেদ ও জাতিভেদে শ্লথ হইয়া, ক্রমশঃ তাহার বিলোপ ঘটিয়াছে। খণ্ড জাতি ও খণ্ড দেশ, ভারতে সর্বত্রই অশান্তি ও অবনতির প্রবর্তনা করিতেছে।

প্রত্যেক নৃপতি
ক্ষুধার্ত শার্দূলমত রয়েছে চাহিয়া
নিজ প্রতিবাসী পানে। ভাবিছে সুযোগ,
বজ্রলম্ফে পৃষ্ঠে তার পড়িবে কেমনে।
সাজিতেছে জরাসন্ধ—দুই পার্শ্বে তার
শিশুপাল, ভগদত্ত, উত্তর ভারত
সুসজ্জিত পৃষ্ঠদেশে,—বিপুল বিক্রমে
ডুবাইয়া দ্বারবতী সমুদ্রের জলে,
সমুদ্র-প্রতিম সৈন্যে প্লাবিবে ভারত।
হস্তিনা হিংসায় মত্ত, ক্ষিপ্ত গ্রহ মত
আঘাতিতে ইন্দ্রপ্রস্থ।

হেথা বাসুকির সৈনাপত্যে অনার্যশক্তি শির উত্তোলন করিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে।

অনার্য শিলায়

মধ্যস্থ ক্ষত্রিয় জাতি পিষিয়া তেমন
নূতন ভারত রাজ্য করিব স্থাপন।

কবি, রূপকে এই হৃদয়বিদারক চিত্র কি অদ্ভুত করিয়া আঁকিয়াছেন।

অসংখ্য গৃধিনী কিবা বিকট দর্শন!—
কেবা সে দেবী, গোবিন্দ,
—কিবা মুখ অরবিন্দ!—
খণ্ড খণ্ড করি যারে শকুন নির্ম্ম,
কেহ হস্ত, কেহ পদ, করিছে ভক্ষণ?
বিঁধিতেছে পরস্পরে
কি হিংসা-কটাক্ষ শরে!
একে অন্য গ্রাস যেন লইবে কাড়িয়া,
একে অন্য আক্রমণ
করিতেছে ঘন ঘন
কিবা পাক-সাট! কিবা চীৎকার ভীষণ!
পশিতেছে কর্ণে যেন আকুলিয়া মন!

কালবশে আর্যশক্তি এখন উন্নতিপথ ছাড়িয়া ঘোর আত্মনির্যাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দহিয়া দহিয়া এই হিংসার অনলে
কমলার পদাশ্রিত বাণিজ্য কমল;
জ্ঞানের সহস্র দল, ভারতী আশ্রয়,

শুকায়েছে, পড়িয়াছে হেলিয়া পশ্চিমে
আর্যসভ্যতার রবি ; আর্য ধর্মনীতি
হইয়াছে পৈশাচিক যজ্ঞে পরিণত ॥

ক্রমশঃ

রৈবতক কাব্য

সমালোচনা

(২)

এই ভারতবিপ্লবের কেন্দ্রস্থানে দাঁড়াইয়া নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট-সন্ধিস্থলে বাসুদেব প্রাদুর্ভূত হন। আমি অবতার-তত্ত্বে বড় বিশ্বাসবান্ নহি। কিন্তু, অবতার অর্থে যদি যুগোপযোগী চরম উন্নতির অবতারণ হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের অবতার। * তাঁহার জীবনের মহাব্রত—

এক ধর্ম এক জাতি
একই সাম্রাজ্য নীতি
সকলের এক ভিত্তি সর্বভূতহিত।
সাধনা নিষ্কাম কর্ম
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম
একমেবাদ্বিতীয়ং করিব নিশ্চিত
ওই ধর্মরাজ্য—মহাভারত স্থাপিত।

* * * * *

---

* এই অর্থে, বাইবেলের য়ুহুদীদেশে খ্রীষ্ট অবতার, যজ্ঞবহুল ভারতে বুদ্ধ অবতার, দাসত্ব-বহুল আরবে মহম্মদ অবতার, আর ফরাশি-বিপ্লবের ফ্রান্সে নেপোলিয়ন অবতার।

শিখাব একত্ব মর্ম
এক জাতি এক ধর্ম
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন
সমগ্র মানব প্রজা, † রাজা নারায়ণ।

সমাজতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের যাহা কিছু উচ্চ, প্রশস্ত ও জ্ঞানগর্ভ, তাহাই আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিতে পাই। ('সোঽহং' ও 'মহাভারত' দেখ।) ভারতের আসমুদ্র গিরি যেখানে যাহা ঘটিতেছে, সকলি তাঁহার নখ-দর্পণে।

ভারতের যত
ধর্মনীতি রাজনীতি নীতি সমাজের
সর্বশক্তি এক কেন্দ্রে হইত কেন্দ্রিত
বিমথিত একদণ্ডে ; সমগ্র ভারত
করিয়া একই নখ-দর্পণে স্থাপিত।

কবি অপূর্ব কৌশলে কৃষ্ণের কৈশোর-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। বিষয়টি পুরাতন হইতেও পুরাতন ; কিন্তু কেমন নূতন করিয়া সাজান হইয়াছে! এমন অদ্ভুত জীবনী, এমন আত্মোৎকর্ষের চরম আদর্শ, বুঝি আর কোনও দেশে নাই।

দুরাচার কংসকর্তৃক পিতা উগ্রসেনের কারারোধ ; দৈবকী ও বসুদেবের প্রতি অত্যাচার, মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে কংসালয়ে শ্রীকৃষ্ণেয় জন্ম ; যমুনাপারে নন্দালয়ে অবস্থিতি ; যশোদার মাতৃস্নেহ ; শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও গোপাল সখ্য ; পুতনাবধ ও কালীয়দমন ; বৈদিক ইন্দ্রযজ্ঞ বিনাশ ও

† পাশ্চত্য-সমালোচকেরা বলেন,—শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে অতীতে বর্ত্তমানের সমাবেশ থাকে ; সহৃদয় ভারতবাসীমাত্রেরই আজ, যে ব্রত, যে পণ, তাহার ছায়া কেমন সুন্দররূপে কৃষ্ণ-চরিত্রে প্রতিভাত হইয়াছে।

পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মের বীজ রোপণ; পবিত্র রাসলীলা ও ফল্গূৎসব; মথুরায় কংসবধ ও নন্দ বিদায়; জরাসন্ধকর্তৃক সপ্তদশ বার মথুরা আক্রমণ ও পরাজয়—শেষ।

বৃথা শোণিতের স্রোতে, কালের প্রবাহে
জীবন-কর্তব্য মম যেতেছে ভাসিয়া

এই দেখিয়া দ্বারকায় সিন্ধুগর্ভে পুরী নির্মাণ; এ সকল পুরাতন হইতে পুরাতন; কিন্তু কবি এক বাসুকিচরিত্র সৃষ্টি করিয়া, এ কাহিনী কেমন সজীব ও ঐতিহাসিক করিয়াছেন, তাহা সমালোচনায় বুঝান অসম্ভব।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্মতত্ত্বগ্রন্থে এইভাবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝিয়াছেন,—

"যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া, এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন; যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্তা হইয়াও, আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই; যিনি সেই বেদ-প্রবল দেশে বেদ-প্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন—'বেদে ধর্ম নয়, ধর্ম লোকহিতে' তিনি ঈশ্বর হউন আর না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ববলাধার, সর্বগুণাধার, সর্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়; তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।"

ব্রাহ্মভক্ত চিরঞ্জীব শর্মা, তাঁহার ভক্তিগ্রন্থ চৈতন্যচরিতে, এই ভাবেই কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই আদর্শ চরিত্র কথায় না রাখিয়া, চরিত্রে প্রতিফলিত করা কত দুরূহ! যে কবি, এই প্রেমময়,

প্রীতিময়, পবিত্রতাময় চরিত্র, আপন মহীয়সী প্রতিভাবলে বাঙ্গালী পাঠকের নেত্রের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, তিনি আমাদের কত শ্রদ্ধা, কত প্রীতি, কত কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তাঁহার কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ, তিনি আদর্শ ভ্রাতা,—

ভগিনী ভ্রাতার মত
কি পবিত্র উভয় হৃদয়
উভয় অমৃতে ভরা বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা
কি মহিমা কি দেবত্বময়।

তিনি আদর্শসখা,—(অর্জুনের উক্তি—)

কৃষ্ণের সংসর্গে
এই কয় দিনে
কি ত্রিদিব খুলিয়াছে নয়নে আমার।
ঘটিয়াছে জীবনের কিবা রূপান্তর।

তিনি আদর্শ প্রেমিক,—(রুক্মিণীর উক্তি—)

প্রাণনাথে যেই ক্ষণ
দেখি দিদি, সম্মুখে আমার
কি স্বর্গ ভাসে নয়নে, কি অমৃত বহে প্রাণে
কি যে মোহ হয় লো সঞ্চার।

এক কথায় তিনি আদর্শ মানুষ, তিনি নর-নারায়ণ, অর্থাৎ দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব—তাঁহার হৃদয় এই উভয়ের অপূর্ব মিলনস্থান। তাঁহার সকল মানুষী শক্তির পশ্চাতে এক অদ্ভুত দৈবী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই উভয় শক্তির অদ্ভুত সমন্বয়ে, কৃষ্ণচরিত্র গঠিত। অতুল পরাক্রম, অনন্ত জ্ঞান ও সার্বজনীন প্রীতি, তাহারি দিব্য উপাদান, অথচ ইহাতে স্বার্থ-পরতার লেশ নাই, আত্মম্ভরিতার লেশ নাই, আত্মাদরের অবকাশ নাই।

কিন্তু আমি ক্ষুদ্র নর—
অনন্ত সংসারে
অসংখ্য কুসুম মাঝে একটি কুসুম।

* * * * *

নারায়ণে কর্মফল করি সমর্পণ
বিনাশিয়া স্বার্থ-জ্ঞান, করহ নিষ্কাম
সমাজ সাম্রাজ্য ধর্ম—

* * * *

বলেন—"মঙ্গলময় নারায়ণ ইচ্ছা তাঁর
অবশ্যই হইবে পূরণ
নাহি সাধ্য মানবের, সে মঙ্গল নিয়তির
এক রেখা করিবে লঙ্ঘন।"

কৃষ্ণের উক্তি—

তুমি সর্বশক্তিমান্
পার ক্ষুদ্র তৃণে তুমি
সৃষ্টিকার্য সাধিতে তোমার।
দেহ শক্তি এই তৃণে
তব প্রেমময় রাজ্য
ধরাতলে করিব প্রচার।

ফলতঃ, মহর্ষি গর্গের সেই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণ সত্যতা লাভ করিয়াছিল—

*করিয়া মোচন
দলিতে ধরার ভার, হইবে পতিত
মানবের অদৃষ্টের মহা পারাবারে

অনন্ত অতলস্পর্শ, ব্যাপি ভবিষ্যৎ
চালিবেক শতমুখে অজস্র ধারায়
পতিত-পাবন-সুধা অনন্ত অমৃত
তব গোচারণ ক্ষেত্র হবে বসুন্ধরা
সমগ্র মানব জাতি গো-পাল তোমার
ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হয়ে দিক্-হারা
দেখি পদচিহ্ন, শুনি বেণুর ঝঙ্কার।
স্থিরভাবে স্বর্গ মর্ত্য করিয়া মিলিত
নরনারায়ণ মূর্তি, রহিবে সতত
সর্বধ্বংসী কালস্রোতে হিমাদ্রির মত।

শ্রীকৃষ্ণের এই মহাব্রতে তাঁহার প্রধান সহায় ব্যাস ও অর্জুন। ব্রহ্মসূত্রের বক্তা, মহাপুরাণের রচয়িতা, বেদব্যাস দ্বৈপায়ন, কাহার কাছে অপরিচিত? এই সুধাকর-নিঃসৃত সুধারাশি আজিও হিন্দু বিরাগীর হৃদয়ে জীবন্মুক্তি ও হিন্দু সংসারীর হৃদয়ে শান্তি-সুখ বর্ষণ করিতেছে। আর অর্জুন? তাঁহার বীর্য্য বহ্নিশিখা আজিও ভারতে নির্বাপিত হয় নাই। এই দেবোপম বীরের বীরত্ব-গাথা আজিও হিন্দুর গৃহে গৃহে, হৃদয়ে হৃদয়ে গীত হয়। তাঁহার চরিত্রের বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক; তবে, রৈবতকের কবিসৃষ্ট অর্জুন চরিত্রের দুই একটি নূতন কথা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইবে।

অন্য দিকে অনার্যের নেতা ও ঈশ্বর বাসুকি। দৃঢ়তা, সাহস, শক্তি ও সবত্যাগী পণে, তিনি অনার্যশক্তির এই নব অভ্যুত্থানে, তাহার নায়ক হইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। তাঁহার হৃদয়ে যে হিংসা-বহ্নি ও বৈরনির্যাতন-তৃষা জ্বলিতেছিল, আর্যরাজ্যের আমূল উৎপাটন ভিন্ন তাহা শান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

শত্রু মম আর্য জাতি ব্যক্তি-নির্বিশেষে
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, আসমুদ্র গিরি
আমাদের এই রাজ্য হরিল যাহারা
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ অনার্যশোণিতে।

বিজেতার অত্যাচার তাঁহার অন্তরের স্তরে স্তরে অনল অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল।

আছিল যে জাতি এই ভারত-ঈশ্বর
আজি তারা হা বিধাতঃ, বিদরে হৃদয়
অস্পৃশ্য উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুকুর অধম।

ইহা অনার্যজাতি-সাধারণ ক্রোধ। বাসুকির পক্ষে ইহার এক ব্যক্তিগত ভিত্তি আছে। সে ভিত্তি দারুণ রাজ্যলিপ্সা, নিরাশ প্রণয় ও অনির্বাণ প্রতিজিঘাংসা। কথিত আছে, বাসুকির পিতার কৌশলে, বসুদেব সদ্যঃপ্রসূত শ্রীকৃষ্ণ শিশুকে গোকুলে লুকাইতে সমর্থ হন। পরে, প্রথম যৌবনে বাসুকির সাহায্যেই

বিনাশি কংসের বীর সেনাপতিচয়
আক্রমি মথুরা কৃষ্ণ, কংসে বিনাশিল।

বাসুকি এখন মথুরার সিংহাসন ও সুভদ্রার করপদ্ম, এই দুই প্রতিদান চাহিয়া বসিল। শ্রীকৃষ্ণ স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—উগ্রসেন মথুরার অধীশ্বর, তাঁর সিংহাসনে আমার কি অধিকার? আর সুভদ্রা?

এখনো বালিকা ভদ্রা, কেমনে তাহারে
অর্পিব পাশব বলে?

বাসুকি ক্রোধে অধীর হইল।

তীরে এসে এতদিনে, আশার তরণী
ডুবিল কি এইরূপে?

অসি নিষ্কাশিয়া কৃষ্ণের বুকে বসাইতেছিল, বলরাম পদাঘাতে ভূতলশায়ী করিয়া, তাহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে সরাইয়া শান্তকণ্ঠে বাসুকিকে বলিলেন—

যে প্রাণ তুমি করিয়াছ দান
কেন কলঙ্কিবে অসি, বিনাশিয়া তারে
নাগপতি ?

সেই অবধি ভীষণ ক্রোধবহ্নি নাগরাজহৃদয়ে সন্ধুক্ষিত হইতেছিল। এই সময় আর একটি বহ্নি-শিখা আসিয়া, তাহার সহিত মিলিত হইল। এ-বহ্নি, দুর্ব্বাসার ঈর্ষ্যা ও ক্রোধাবিষ্ট হৃদয়জাত। কৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সহিত, ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রচারিত হইতেছিল। ইহার মূল মন্ত্র--

এক জাতি মানব সকল
এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম ;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয়
একমাত্র, মহাযজ্ঞ—নিষ্কাম সাধনা।

এখন এই কয়টি কথাতেই দুর্ব্বাসার বিশেষ আপত্তি। আজি-কালিকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত, নিষ্কাম ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ বিদ্বেষ। তাঁহার বিবেচনায় ইহার মূলে নাস্তিকতা আছে। তাঁহার মতে—

সকাম মানবধর্ম্ম, তাহার সাধন
যাগযজ্ঞ, মূল বেদ ; সাধক ব্রাহ্মণ।

তাহার উপর, তিনি আবার মূর্ত্তিমান্ কোপ ; তাঁহার কথায় কথায় অভিশাপ, অভিমান তাঁহার অঙ্গের ভূষণ। কবে কোথায় কৃষ্ণার্জ্জুনকে

মুখের আশীর্বাদ করিয়াছেন, তাঁহারা জলধি-গর্জনে শুনিতে না পাইয়া, গলবস্ত্র হয়েন নাই—এজন্য, ঘোর অভিসম্পাত দিতে কুণ্ঠিত নন।

আমি দুর্বাসা তুচ্ছ! লও অভিশাপ
যাদব কৌরবকুল হইবে বিনাশ।

এই নিমিত্ত, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার জন্য, এই অভিশাপ সফল করিবার জন্য, কতই উদ্যম, কতই উদ্যোগ, কতই ঔর্ণনাভ-রচনা।

তাঁহার বিশ্বাস, বৈষ্ণব ধর্ম অঙ্কুরে উন্মূলিত না হইলে—

ভস্মিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম, সেই পাপানল
প্লাবিবে ভারত-রাজ্য দাবানল মত।

* * * * *

হবে ক্ষত্রী জাতিশ্রেষ্ঠ ধরার ঈশ্বর
শীর্ষস্থানে তার সেই ভণ্ড-নারায়ণ।

এই ভয়ে তিনি বাসুকির সহিত মহাসন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

আইস ব্রাহ্মণ আর অনার্য মিলায়ে
মধ্যস্থ ক্ষত্রিয় জাতি পিষিয়া তেমন
নূতন ভারত-রাজ্য করিব সৃজন।

বন্ধন আরও দৃঢ়তর করিবার নিমিত্ত, রূপবতী, যুবতী বাসুকি-ভগিনী জরৎকারুর পাণিপ্রার্থী * হইলেন। কুব্জপৃষ্ঠ, শুষ্কমাংস, পলিতকেশ,

---

* এ বিবাহ ঐতিহাসিক নহে। মহাভারতে জরৎকারু, জরৎকারুর পত্নী, আস্তিকের মাতা। এই আস্তিক, জনমেজয়ের সর্পসত্রে, নাগকুল রক্ষা করেন। কবি এই অনৈতিহাসিক ঘটনা রচনা করিয়া, দুর্বাসা ও জরৎকারু চরিত্রের কত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

আশৈশব ব্রহ্মচারীর পক্ষে, এ বন্ধন বড় সুখকর নহে। ফুল্ল নলিনীর শিশির-সমাগম হইল।

তবে এ নাগপাশ ইচ্ছা করিয়া গলায় বাঁধা কেন? রূপের মোহে নহে, কামের তৃষায় নহে, তবে কেন?

রাহুগ্রস্ত সত্য ধর্ম, কারু, স্থাপিবারে
অনার্য'সাম্রাজ্য এই ভারতে আবার
সাধিতে এ মহাযজ্ঞ বনবাসী আমি
পরিয়াছি পরিণয় সংসার-বন্ধন।

ইতিমধ্যে এক মহাসঙ্কট উপস্থিত। রৈবতকে ভদ্রার্জুনের বিবাহ ঘটাইয়া, কৃষ্ণ, যাদব ও পাণ্ডবকুল অনশ্বর প্রণয়-বন্ধনে বদ্ধ করিতে চলিলেন। মহা বিপদ্! দুর্বাসা দেখিলেন, এ বিবাহে বিভ্রাট না ঘটাইলে, তাঁহার আশালতা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া, ঘটক সাজিয়া, বলদেবের কাছে উপস্থিত। পাণ্ডবের অজস্র নিন্দাবাদ ও কৌরবের অনন্ত স্তুতিবাদ কীর্তিত হইল। বলরাম আশুতোষ; স্তবে তুষ্ট হইয়া স্থির করিলেন, কৌরবের মত তাঁহার অভিমত ভক্ত আর ত্রিসংসারে নাই। সুযোগ পাইয়া দুর্বাসা ঘট্‌কালী আরম্ভ করিয়া দিলেন,—

পবিত্র করিতে কুল, দুর্যোধন অকিঞ্চন
চাহে পদে এক ভিক্ষা আর—
হয় যদি অভিমত, মাগিবে সে পদাম্বুজে
সুভদ্রার পাণি-উপহার।

বলরাম শুনিয়া আনন্দে আকুল; একেবারে দুর্যোধনকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে, বাসুকিও সুভদ্রার আকাঙ্ক্ষী। তাহার প্রেমে অনেকটা কামিতা, অনেকটা পশুত্ব আছে। তাই সে পাশব-বলে সুভদ্রাকে হরণ করিতে প্রয়াস পায়; অদৃষ্ট ঘটনার আবর্তে পড়িয়া বিফলমনোরথ হইতে হয়; কিন্তু তাহা হইলেও এ প্রেমে ত্রিদিবের আব্‌ছায়া আছে।

মুদিলে নয়ন
নিরখি ভদ্রার রূপ
অবশ যখন দেহ মূর্চ্ছায় নিদ্রায়
অতুলিত সেই রূপ দেখিছি স্বপন।

দুর্বাসার কুটিল চক্রের কথা শুনিয়া বাসুকি

বনের বর্বর আমি, তথাপি না পারি
দেখিতে একটি অশ্রু রমণী নয়নে
ভদ্রার বিষাদ-মূর্তি সহিব কেমনে।

দুর্যোধন? দুর্যোধন সুভদ্রার দক্ষিণে বসিবে?

আমার শশাঙ্ক অঙ্কে ধরিবে যে জন
নিবাইব আমি তপ্ত শোণিতে তাহার
প্রণয়-পিপাসা মম মরুময় প্রাণ

দুর্বাসা মহা ফাঁপরে পড়িলেন। অনেক বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া বাসুকিকে বুঝাইয়া দিলেন যে, দুর্যোধনের বিবাহে ঘটকালী শুধু সিন্ধুতীরে অনল জ্বালিবার কল। অর্জুনও সুভদ্রার প্রেমাকাঙ্ক্ষী; অতএব, এ বিবাহে, ফলে—

কৌরব পাণ্ডবে
বাজিবে তুমুল রণ * * *
হইবে লোহিত
ক্ষত্রিয়ের তপ্তরক্তে কৃষ্ণ-পারাবার।

অবশেষে
ভারতের রাজলক্ষ্মী সুভদ্রার সহ
আসিবেন অঙ্কে তব

এই সর্গে কবি বাসুকি-হৃদয়ে প্রণয়-আশা ও রাজ্য লিপ্সার সংঘর্ষের সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। বোধ হয়, তাহার রাজ্য-লিপ্সাই বলবত্তর। তাই বাসুকি ঋষির এই প্রবোধে শান্ত হইল। তাই ঋষিকে প্রাণাধিকা ভগিনী সম্প্রদান করিয়া, বজ্রাহত শুষ্কতরুতে কুসুমিতা মাধবীলতা তুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইল।

কে সে ভগিনী ? জরৎকারু। জরৎকারু নাগরাজ-দুহিতা। যত্নে পালিতা। তাহার রূপ অতুলিত—উষান্তে নীল-নলিনীর মত এই প্রস্ফুট। তাহার হৃদয় নারী-সুলভ কোমলতা ও অনার্য নারী-সুলভ কঠোরতায়* গঠিত। প্রেম ও পিপাসা, গর্ব ও অভিমান, আশা ও দুরাশায় বিচিত্রিত।

কথিত হইয়াছে, কৃষ্ণকে বাসুকির আলয়ে যাইতে হইত। একদিন 'দিবাশেষে সন্ধ্যাবেলা' জরৎকারু দীর্ঘিকাতটে বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। বাসুকির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই ভীমকান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া জরৎকারুর হৃদয়ে কিসের ছায়া পড়িল।

গাঁথিতেছিলাম মালা
ছিঁড়িলাম একি জ্বালা
গাঁথা মালা কুসুম নিচয়।

* * * *

---

* অষ্টম সর্গে জরৎকারু সখী সংবাদে আমার শেক্ষপিয়রের পোরসিয়ার (Portia in Merchant of Venice) প্রণয়ী সমালোচনা মনে পড়ে। পোরসিয়া বোধ হয় জাতীয় চরিত্রের শ্লেষপূর্ণ আলোচনায় অধিকতর অভিজ্ঞ। জরৎকারুর সমালোচনায় অভিমানের তীব্রতা অধিক।

নিক্ষেপি' বাপীর জলে
শেষে ছিন্ন ফুলদলে
বেগে গৃহে করিয়া গমন।
উপাধানে রাখি মুখ
শয্যায় রাখিয়া বুক
দেখিলাম কতই স্বপন॥

ক্রমে নিত্য উহাদের দেখা হইত। কত কথা হইত। বালিকার প্রাণ প্রেমে পূর্ণিত হইল। অহঙ্কার, অভিমান কারুর সব ভাসিয়া গেল। এইরূপে এক এক দিন করিয়া চারিটি বৎসর কাটিয়া গেল। কৃষ্ণ দেখিলেন, আয়োজন পূর্ণ হইয়াছে। আর শ্লথ প্রযত্নের অবকাশ নাই। প্রেম-অভিনয় এখন কর্তব্য-স্রোতে ভাসাইতে হইবে। কৃষ্ণ চঞ্চল হইলেন। শেষ—

একদিন মধু মাসে মধুর চাঁদিনী হাসে
মাধুরী ঢালিয়া নীলিমায়—
সরসীর নীল নীরে ঢালিয়া মাধুরী তীরে,
উপবন শ্যামল শোভায়।

দুজনে অনেকক্ষণ নীরবে সেই ঘাটে বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণ বুঝি কোমল প্রাণে ব্যথা দিতে পারেন না। অনেকক্ষণ পরে, ধীর-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—

পূর্ণ মম আয়োজন
যে সমুদ্রে এই ক্ষণ
দিব ঝাঁপ, কোথা কূল তার।

ডুবি তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু,

এ অতুল স্নেহের তোমার
পারাবার পরিমাণ বিন্দুমাত্র প্রতিদান
হইল না জীবনে আমার।

হয় ত আর ফিরিয়া আসিব না।

আসি কিনা আসি আর
ডুবি ভাসি অনিবার
হৃদয়েতে রহিবে অঙ্কিত।
তব স্নেহমাখা মুখ
তব স্নেহপূর্ণ বুক
তব মূর্তি স্নেহেতে সৃজিত

কারুকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যে মহাব্রতে তিনি ব্রতী, তাহাতে নাগরাজ-ভগিনীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধ * অসম্ভব।

---

* এইখানে নবীনবাবুর সহিত আমার কিছু বিবাদ আছে। কারুর সহিত এই প্রেমের চিত্র আঁকিয়া কি কৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্কের ঈষৎ ছায়াপাত হয় নাই? কই, কৃষ্ণের উত্তর জীবনে এ প্রেমের ত কিছুই রেখাঙ্ক দেখিতে পাই না? অর্জুনের কাছে বর্ণিত আত্ম-কাহিনীতে ত ইহার উল্লেখ নাই? কৃষ্ণ কি তবে কারুকে বিস্মৃত হইয়াছেন? এই কি তাঁহার

"থাকিবে চিরদিন,
হৃদিপটে অঙ্কন, সে সব বিলসিত লীলা?"

হয় ত, কবি দ্বিরুক্তিভয়ে একথার উল্লেখ করেন নাই। হয় ত, কৃষ্ণ ইহাকে জীবনের অতি প্রধান ঘটনা বলিয়া ভাবেন না। যাহা হউক, কারুর ছায়া তাঁহার প্রাণে নাই কেন? উত্তরে এই কথা বলা আবশ্যক যে, কারু-চরিত্র এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। হতভাগিনী কারুর প্রত্যাখ্যান-অপমানের বিফল প্রতিদান চেষ্টায়, কৃষ্ণের আদর্শ ক্ষমা-চরিত্র আঁকিয়া বোধ হয়, কবি এ দোষ, গুণে পরিণত করিবেন। যাহা হউক, রৈবতক কাব্য সম্পূর্ণ না হইলে, এ কথার চূড়ান্ত মীমাংসা অসম্ভব।

এস সহোদরা সম
হও ব্রতে সহায় আমার।
এস ভগ্নি দুই প্রাণ, নারায়ণে করি দান
আমি ক্ষুদ্র মানব কি ছার।

কারু ভগ্নহৃদয়ে কৃষ্ণের অঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইলেন; মূর্চ্ছান্তে গর্জিয়া বলিলেন—

বুঝিলাম নিরমম, তব ব্রত তব পণ

* * * *

নিব ব্রত? লইলাম—দিব ঘোর প্রতিদান
পাইলাম যেই অপমান।
জ্বালাইলে যে শ্মশান, করিবে অনার্য্য। প্রতি
তব তপ্ত রক্তে নিরবাণ॥

পাঁচ বৎসর বহিয়া গিয়াছে। কারু আজ সেই ঘাটে বসিয়া অতীত জীবনের আলোচনা করিতেছেন। বাসুকি আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

ব্রাহ্মণ (দুর্বাসা) পাণি-প্রার্থী তব।
এক রেখা মুখোপর
নাহি হ'ল রূপান্তর
জরৎকারু রহিল নীরব।

কারু জানিতেন এ বিবাহ চুক্তিমাত্র। এ বিবাহ কৌপীনধারী শ্মশানচারী দুর্বাসার সঙ্গে। কিন্তু এ বিবাহে হয়ত নাগভূমির উদ্ধার সাধিত হইবে। হয়ত, তাঁহার প্রতিদান-ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। তাই

এক রেখা মুখোপর
নাহি হ'ল রূপান্তর

নাগরাজ ভগিনীর মনোভাব বুঝিলেন

বুঝি সে নীরব ভাষা
বিধূমিত সে নিরাশা
নাগেন্দ্র চলিলা অন্যমনে।

কিছু দিনে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

জরৎকারুর আর একবার মাত্র এ-কাব্যে সাক্ষাৎ পাই। তখন তাঁহার নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে। তাই নূতন বেশ। কারু আজ তপস্বিনী। অভিমান অহঙ্কার গর্ব সব ভাসাইয়া কারু আজ সন্ন্যাসিনী।

পরিধান রক্ত বাস, রুদ্রাক্ষের মালা
শোভে অঙ্গে অঙ্গে ধূলা-ধূসরিত কেশ
ভস্মে ঢাকা যৌবনের অপরূপ ডালা।

কারু চন্দ্রালোকে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিলেন। কৃষ্ণ-প্রেম-আকাঙ্ক্ষিণী আজ দুর্বাসার শয্যা-সঙ্গিনী। কৃষ্ণ-প্রেমের নৈরাশ্য-জ্বালা এখনও নির্বাপিত হয় নাই।

'এক পিপাসায় প্রাণ সতত আকুল।'

কারু দর্পণে আপন উল্লসিত রূপরাশি দেখিতেছিল। হায়! এত রূপেও শ্রীকৃষ্ণের মন উঠিল না।

ফুটন্ত নলিনী দেখিয়া তোমার
ভুলিল না মন।

এমন সময় বাহিরে থক্ থক্ শব্দ হইল। কারু বুঝিলেন তাঁহার কুঞ্জ-কুটীরে নটবর উপস্থিত। দুর্বাসার পৃষ্ঠে কুঁজ, হস্তে যষ্টি, গাত্রে পূতি-গন্ধ। কারুর দ্বার খুলিতে কিছু বিলম্ব হইল। দুর্বাসা চটিয়া আগুন! ভাবিলেন, কারু উপপতি লইয়া রঙ্গ করিতেছিল। ভীম যষ্টি উত্তোলন

করিয়া কারুকে মারিতে উদ্যত। কিন্তু কেমন মাধ্যাকর্ষণের অত্যাচারে কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যাই ভূতলে পড়িতেছিলেন, কারু ধরিয়া ফেলিল।

> পাপিয়সি! দুশ্চারিণি! ধরিলি আমারে
> ছুঁয়িলি পবিত্র অঙ্গ!

কারুর কোমল অঙ্গে ভীম পদাঘাত পড়িল। কারু নীরবে এ অপমান সহ্য করিল। দুই করে দুর্বাসার দুই পদে ধরিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তিনি দুশ্চারিণী নহেন। সেই দুটি পাদপদ্মে তাঁহার জীবন-যৌবন মন সব সঁপিয়াছেন। দুর্বাসা কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। কারুকে অনার্য রাজ্য উদ্ধার ব্রতে প্রোৎসাহিত করিয়া পথশ্রমে নিদ্রিত হইলেন। কারু বিলাসিনী—তপস্বিনী সাজিল। দুরাকাঙ্ক্ষিণী, ভ্রাতার অত্যাচার অম্লান মুখে সহিয়া রহিল।

অভিমানিনী বিনা দোষে পদাঘাত সহ্য করিল। কেন?

> পাপিষ্ঠের ঘূর্ণ্য চক্রে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
> দেখিব নিবে কি জ্বালা? দেখিব কি করি
> প্রতিদান দিতে আর পারি প্রাণনাথ
> সেই প্রত্যাখ্যান আর এই পদাঘাত।

কারু-চরিত্র আপাততঃ এই খানেই শেষ হইয়াছে। বাসুকি, দুর্বাসা ও জরৎকারু, তিনটি চরিত্রই এখনও অপূর্ণ। যাঁহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, উক্ত মহাকাব্যে যে সকল চরিত্রের কেবল নামমাত্র উল্লিখিত আছে, কবি অপূর্ব কৌশলে, বিচিত্র কল্পনা-বলে, তাহাদের কেমন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই কথা বুঝাইবার জন্যই আমাকে এত কথায় বাসুকি, দুর্বাসা ও জরৎকারুর চরিত্রের সমালোচনা করিতে হইল।

দুর্বাসা-চরিত্রের বিষয় আর কিছু বলিতে হইবে, ভাবি নাই; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, আর দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। রৈবতকে আমরা দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-চরিত্রের পরিচয় পাই। একের দৃষ্টান্ত ব্যাসদেব, অপরের প্রতিনিধি এই দুর্বাসা। এক উন্নতি-শৈলের দুরারোহ শিখর, অন্য অধোনতির অতল সাগর সীমা। আকাশ, পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছে,— ব্রাহ্মণের অপূর্ব প্রতিভা কালবশে জঘন্য আত্মসার জিঘাংসার চরিতার্থ-করণে নিয়োজিত হইয়াছে। ক্ষীরোদ সমুদ্র আবিল হইলে, যেমন তাহাতে একটা গভীর ঘৃণার কারণ অন্তর্নিহিত থাকে, অধঃপতিত দুর্বাসা-চরিত্রেও তেমনি একটা কিছু লুক্কাইত দেখি। তাই দুর্বাসা-চরিত্র, সাধারণতঃ ঘৃণিত করিয়া চিত্রিত হইয়াছে।

কিন্তু এই ঘৃণিত চরিত্রে মহত্ত্বের একটু অবশেষ আছে। দুর্বাসার জিঘাংসা আত্মসার হইলেও, কতকটা জাতীয়তামূলক; ব্রাহ্মণ জাতি সমাজের শীর্ষ-স্থান-ভ্রষ্ট হইতেছে; দুর্বাসার বাহুবল নাই; কলে কৌশলে তাহার প্রতিবিধান প্রয়াস। এ অবধি কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু এইবারেই গোল। কেহ কেহ বলেন, আর যাহা হউক, দুর্বাসাকে কুব্জ-পৃষ্ঠ করা রুচিসঙ্গত হয় নাই। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন যে, কুঁজের সহিত মহাকাব্যের আলোক-আধার সম্পর্ক—একের বিকাশে অপরের বিনাশ। তাঁহাদের বোধ হয় জানা নাই যে, ইলিয়াদের থারসাইতিস্‌ও (Thersites) কুব্জপৃষ্ঠ, অথচ, ইলিয়াদ কাব্যাংশে জগতে অতুল। কেহ কেহ বলেন, 'বেশ কথা, কুঁজে আপত্তি নাই; কিন্তু খক্ খক্ কাশি কেন? স-কাশি দুর্বাসা কি মহান্ হইতে পারে না?' এই শ্রেণীর সমালোচককে আমার বক্তব্য এই যে, দুর্বাসা সর্বত্র সকাশি নহেন। যখন তিনি বাসুকির সহিত মহাসন্ধিবিধানে ব্যস্ত, যখন তিনি বাসুকির খিন্নমান প্রাণে উৎসাহ-বারি সেচনে প্রবৃত্ত, তখন সে কাশি, দেহের অতি নিগূঢ়

স্তরে বিলীন থাকে, তখন ইহার জুগুপ্সিত আরাব আমাদের সুষ্ঠু কর্ণে ধ্বনিত হইয়া রসভঙ্গ করে না। আর বুঝিয়া দেখিলে কি দুর্বাসা-চরিত্রে কিছুই জুগুপ্সার অবসর নাই? গোষ্পদ সমুদ্রের স্পর্দ্ধা করিলে, যেমন তাহাতে একটা রহস্যের উদ্দীপনা থাকে, ভারত-বিপ্লবের মহাশক্তি-সংঘর্ষে দুর্বাসা-তৃণের ওতঃপ্রোতভাবে কি তেমনি একটা কিছু নাই? কবি রৈবতকে এইটুকু প্রস্ফুট করিয়া কি বিশেষ অপরাধী হইয়াছেন? তা'ছাড়া দুর্বাসার এক একটা কাজ বাস্তবিক জুগুপ্সা-জনক। ব্রাহ্মণ, পরব্রহ্মের উপাসনা ছাড়িয়া, যখন ঘটকালী-প্রসঙ্গে বলদেবের উপাসনা করেন, সমাজের অপচার-প্রসঙ্গ ছাড়িয়া, গৃহিণীর ব্যভিচার আবিষ্করণে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার চরিত্র জুগুপ্সিত বই আর কি? না হয়, এই জুগুপ্সায় পৃষ্ঠে কুঁজ ও কণ্ঠে কাশি সহায়ক হইল, তাহাতে দোষ কি? দুইবার মাত্র আমরা দুর্বাসার কুঁজের সাক্ষাৎকার পাই, দুইবার মাত্র তাঁহার কাশি শুনিতে পাই, প্রথম দুর্য্যোধনের ঘট-কালীতে, দ্বিতীয়বার জরৎকারুর কুঞ্জকুটীরে,—যথায় তিনি কারুর কেশাকর্ষণ নির্যাতনে প্রবৃত্ত। আমার বিশ্বাস, দুর্বাসা-চিত্রে এখানে এই রঙ্ ফলাইয়া, কবি কাব্যের উৎকর্ষই সাধন করিয়াছেন। কারু দুর্বাসাকে যে চক্ষে দেখিত, এখানে * দুর্বাসা-চরিত্রের সেই অংশটুকু কবি দেখাইয়াছেন, ইহাতে কারু-চরিত্রের সৌষ্ঠব রক্ষিত হইয়াছে। বিলাসিনী নবীনা কারু, অশীতিপর কুব্জপৃষ্ঠ স-কাশি বৃদ্ধকে কেন প্রণয়-চক্ষে দেখিতে পারে নাই, তাহা

---

* শুনিতে পাই, মহাকবি শেক্ষপীয়র নাকি এ প্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। 'Julius Caesar' নাটকে ব্রুটাস প্রভৃতি রাজনৈতিক ষড়্‌যন্ত্রকারীরা সিজারকে যে ভাবে দেখিতেন, যে ভাবে দেখিয়া স্বদেশ-বাৎসল্যে প্রণোদিত হইয়া, সিজারের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই ভাবেই নবীনবাবু আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। বৃটীশ কবি যাহা করিয়াছেন, আমাদের কবিও না হয় তাই করিলেন, দোষ কি?

আমরা অনুভব করি; অনুভব করিয়া, তার ঘৃণা, ঈর্ষা, উদ্দামপিপাসার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করি। কবির এই ত কবিত্ব! কবিসৃষ্টির এইত নৈপুণ্য! (ক্রমশঃ)

---

(৩)

এতদূর মানিয়া লইয়া, কেহ হয় ত বলিবেন, "বেশ কথা! কিন্তু ইহাতে কি দুর্বাসা-চরিত্র অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট হইল না? একবার মহান্,— একবার ক্ষুদ্র, একি তর?" উত্তরে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা যদি অসঙ্গতি-দোষ হয়, তবে কবি-সৃষ্টি কেন, বিধি-সৃষ্টিও এই অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট। শুনিয়াছি, উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক বেকন নাকি দিব্য প্রতিভায় আকাশ স্পর্শ করিয়া, নৈতিক ক্ষুদ্রতায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতেন। আর শ্রেষ্ঠ কবি-সৃষ্টিতেও এ অসঙ্গতির অভাব নাই; মিল্‌টনের শয়তানই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথমসাক্ষাৎকারে অতুল সাহস, অমিত বিক্রম, উদ্দম আকাঙ্ক্ষা, অসীম স্পর্দ্ধা ও বরণীয় আত্মত্যাগে তাহাকে দেবদেবের অনুরূপ প্রতিযোগী বলিয়া মনে হয়; কিন্তু, ক্রমশই তাহার ক্ষুদ্রত্ব প্রস্ফুট হইতে থাকে। শেষে নৃশংস কঠোরতায়, দারুণ ঈর্ষ্যায়, জুগুপ্সিত খলতায় ও পাতালস্পর্শী নীচতায় তাহাকে সরীসৃপসর্প বলিয়া ভ্রম হয়। এই সর্পতেই রূপান্তরিত করিয়া কবি, শয়তান-চরিত্রের উপসংহার করিয়াছেন। দুর্বাসা-চরিত্র এই ভাবে বুঝিলে, বোধ হয়, আর কাব্যের অনুপযোগী বলিয়া বোধ হইবে না।

(৪)

পাঠক, কখন শিশিরসিক্ত সদ্যঃস্ফুট নলিনীতে অরুণাভাস দেখিয়াছেন? পদ্মের রক্তাভ হৃদয় আর একটু রক্ততর হয়; মধুর শোভায় আর একটু মাধুরী-সমাবেশ হয়। যদি দেখিয়া থাকেন, তবে সুভদ্রার প্রেম বুঝিতে পারিবেন। এই প্রেমালোকে রৈবতক উদ্ভাসিত। দুশ্চারিণীর কাম-মূলক বাসনার প্রবাহ দেখিলে, হৃদয় যেরূপ বিজাতীয় ঘৃণায় অভিভূত হয়, পাপের ছায়াশূন্য অমৃতে ভরা বালিকা-হৃদয়ে প্রেমের প্রথম আবেশময় হিল্লোলে, প্রাণ তেমনই মধুররসে আপ্লুত হয়। * সুভদ্রা আদর্শ রমণী, সুভদ্রা রমণী-কৃষ্ণ, রমণীর পূর্ণ-সৃষ্টি।

স্নেহে ভরা মুখ
তার, স্নেহে ভরা বুক। স্নেহসুধা রাশি
ভদ্রার ঈষৎ হাস্যে পড়ে ছড়াইয়া।

* * *

যেইখানে রোগী শোকী, ভদ্রা সেইখানে
মূর্তিমতী শান্তিরূপে। অশ্রু যেইখানে
সেখানে ভদ্রার কর। * *
ডাকিছে যেখানে
অনাহারে পশু পক্ষী দরিদ্র ভিক্ষুক
সেইখানে অন্নপূর্ণা সুভদ্রা আমার।

* আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কেবল-মাত্র সুভদ্রার নামটি আছে। কাশীদাসের সুভদ্রা কতক কাব্যোপযোগিনী হইলেও, প্রগল্‌ভা, মুখরা ও কামাকুলা। কিন্তু আমাদের কবির সুভদ্রা চরিত্র কেমন উদার, মধুর, শান্ত ও 'অনশ্বর দিব্যতায়' পরিপূর্ণ। পাঠক কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

শস্ত্রে ও শাস্ত্রে সুভদ্রা কৃষ্ণ-কর্তৃক সযত্নে অধ্যাপিত হইয়াছে। ভ্রাতার নিষ্কাম দেবভাব, ভগিনীর হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই প্রাণে একটু উদাসীনতা, একটু অপার্থিব ভাব ; তাই, জগতের প্রতি একটু অনাস্থা, একটু শৈথিল্য।

সংসারের স্বার্থ-ছায়া, কুটিলতা দাগ
নাহি পায় স্থান পার্থ, তাহার হৃদয়ে
নির্মল সরল সেই দয়ার সাগরে।

তাঁহার মতে—

জগতের পত্নী জগতের মাতা
জগতের দাসী রমণীচয়।

তাই সুভদ্রা—

না দিদি মাগিব—সর্ব প্রাণীপতি
জগত যৌতুক প্রকৃতি ঘর।

বল দিদি বল, কেমন বিবাহ
কেমন যৌতুক কেমন বর ?

তাঁহার মতে—

বিবাহ ! বিবাহ ! বিবাহ ! কেমন !
কারে বল তুমি বিবাহ ছার !

হৃদয়েতে যবে করেছ স্থাপন
আছে বাকি কিবা বিবাহ আর ?

বিবাহে কি ফল ? কেন ?

পতিতে প্রথম, অপত্যেতে পরে
পরে পরিজনে শতেক মুখে।

শেষে সীমা ছাড়ি ঢালি প্রেমধারা
অনন্ত প্রাণীর অনন্ত বুকে।

সুভদ্রা পরিজনসহ রৈবতকে দেবার্চনায় যাইতেছেন।

দেখিলেন, এক শুকের শাবক
পড়ি বৃক্ষ মূলে আহত দেহ।

তৃষ্ণায় তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত। কাতর নয়নে জল ভিক্ষা চাহিতেছে। সকলে অনায়াসে চলিয়া গেল ; কিন্তু সুভদ্রার—

কাঁদিল পরাণ ভিজিল নয়ন
ছুটিলা লইয়া সরসী পার।

করুণাময়ী শিরীষ-কোমল করে তাহার অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল, মুখে জলসেচন করিল। কতক্ষণে—

উঠিয়া বসিল, বিহঙ্গ শাবক
আনন্দে ভদ্রার ভরিল প্রাণ।
হৃদয়ে লইয়া কত কি কহিয়া
কতই করিলা চুম্বন দান।

অনেকে হয়ত, এ রমণীকে গীতার বৈরাগ্যে বিরাগিনী ভাবিয়া, এবং স্ত্রীলোকের মুখে 'অনন্ত', 'নিষ্কাম', 'নিখিল জগতে একই প্রাণ' এ সকল কথা শুনিয়া, নাসিকার অগ্রভাগ কুঞ্চিত করিবেন। তাঁহাদের কেমন মন তাঁহারাই জানেন! আমি কিন্তু এমন রমণী পাইলে, তাঁহাকে স্বর্গের দেবী ভাবিয়া, ভক্তিপুষ্পে পূজা করিয়া জন্ম সার্থক করি।

শিশুকাল হইতে কৃষ্ণ সুভদ্রাকে পার্থানুরাগিনী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার হৃদয়-পটে অর্জুনের মহিমময় চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রযত্ন করিয়াছিলেন।

(কৃষ্ণের উক্তি)—

এই পুষ্পহারে
অর্জুনের বীরকণ্ঠ করিয়া ভূষিত
শিক্ষা দীক্ষা আশা মম করিব সফল।
ভূতলে দ্বিতীয় যোগ্যপতি নাহি তার।

এই বীজ কতক পরিমাণে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই সময়, অর্জুন রৈবতকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অঙ্কুরে জলসেক হইল।

একদিন যাদব-রঙ্গাঙ্গনে যদুবীর ও পুরনারীগণের সমক্ষে, অর্জুন অত্যদ্ভুত অস্ত্রক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিলেন। বীরাঙ্গনার বীর হৃদয় গুণানুরাগে আপ্লুত হইল। বিকচ কমলে অরুণাভাস ঘটিল। আয়ুধ-ক্রীড়া-চিত্র সুভদ্রার হৃদয়-পটে অঙ্কিত রহিল। সুধু হৃদয়-পটে নহে; কলানুরাগিণীর মোহন তুলিতে, ইহা চিত্রফলকে প্রতিবিম্বিত হইল। অজানিত প্রেমের ব্রীড়াময়ী ছায়া বালিকা-হৃদয় ছাইয়া ফেলিল।

কি যেন হয়েছে কোমলতা আরো
সন্ধার কোমল মুখে।
কি যেন কি ভাব কোমলতা আরো
হয়েছে সন্ধার বুকে॥

প্রেমের এই অস্ফুটবিকাশ, সখী সুলোচনার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

সুভদ্রা এক বিজন কক্ষে বসিয়া সেই চিত্র আঁকিতেছিলেন, সখী সুলোচনা চুরি করিয়া সেখানে গিয়া, চিত্র চুরি করিয়া সত্যভামাকে দেখাইল। আর সুভদ্রাকে (আহা! ভাল মানুষের উপরেই কি সবাই অত্যাচার করে!) চোর বলিয়া, পুরোদ্যানে লতাগৃহে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিল। সুভদ্রা সেই লতাকুঞ্জে, 'পল্লব আঁধারে, খণ্ড

জ্যোৎস্নার * মত’ একাকিনী বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। আজ হৃদয়ে কি এ নবীন ভাব! কই, তিনি ত কত চিত্র আঁকিয়াছেন, কেহই ত কখন তাঁহাকে দোষে নেই। এই চিত্রখানি

কেন লুকাইয়া আঁকি
কেন লুকাইয়া রাখি ;
* * * *
ভূতলে গগনে
প্রকৃতির অঙ্কে অঙ্কে হৃদয়ে আমার
দেখি সেই ঢাকাচিত্র ভাসে অনিবার।

ইতি মধ্যে মৃগয়াশ্রান্ত অর্জুন আসিয়া সেই উপবনে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন। কৃষ্ণের মুখে সুভদ্রার গুণগরিমার পরিচয় পাইয়া, অর্জুন পূর্বেই সুভদ্রার পক্ষপাতী ছিলেন। এখন তাঁহার আলোকসামান্য রূপে বাসনায় ইন্ধনসংযোগ ঘটিল। উঠিয়া ধীরে ধীরে অট্টালিকা-অভিমুখে যাইতেছিলেন ; কুঞ্জগৃহে সেই মোহিনী মূর্তি দেখিয়া. আর চরণ চলিল না। স্থির নেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। একবার ভাবিলেন, স্থানান্তরে যাই : কিন্তু মন চাহিল না। একবার ভাবিলেন—

যাই তার কাছে, কই চলে না চরণ

পদ অগ্রসর হয় না। হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। কুঞ্জদ্বারে গিয়া পাশবদ্ধা ভদ্রাকে দেখিয়া তরল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,

একি ? কে তোমারে
এমন নিষ্ঠুর রূপে করিল বন্ধন ?

---

* কবির উপমা-কৌশলে আমার কালিদাসের কথা মনে পড়ে। কালিদাস উপমান সংগ্রহে অদ্বিতীয়।’ নবীনবাবু ভারতের কবি বলিয়াই বুঝি, তাঁহার পদানুসারী হইতে

পারিয়াছেন। গুটী কয়েক দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করিলাম। আরও কত এ কাব্য-খনির ভিতর মণির মত নিহিত আছে—

অনল ভুজঙ্গ মত, [illegible] সুন্দর।

*　　*　　*　　*

পল্লব আঁধারে খণ্ড জ্যোৎস্নার মত
অলকা আঁধারে ওই অতুল আনন।

সুভদ্রা-অর্জুন রণস্থলে মিলিত হইলেন,—

সিংহ সহ রণে　　মিলিল সিংহিনী
সূর্যে উষা তেজস্বিনী।

*　　*　　*

পুরদেবীগণ
চলিয়াছে দ্বারাবতী—কুসুম উদ্যান
মন্থর তরঙ্গে যেন চলেছে ভাসিয়া।

*　　*　　*

সলিল তাহার
সুতরল পুণ্য রাশি; স্নিগ্ধ সমীরণ
পুণ্য শ্বাস; পুণ্য ভাষা বিহঙ্গ কুজন।

*　　*　　*

ঈষৎ ঈষৎ ওই আরক্ত অধর
সুধাসিক্ত কাঁপিতেছে; মন্দ সমীরণে
কাঁপিতেছে দুই ফুল্ল গোলাপের ফুল
পল্লবের অন্তরালে, শিশিরে সজল।

*　　*　　*

ভীমকান্ত অর্জুন কঠোরতা ও কোমলতায় গঠিত।

আলিঙ্গি মধ্যাহ্ন রবি শশী পূর্ণিমার
আতপ জ্যোৎস্না মাখা

*　　*　　*

সুভদ্রার মাথা ঘুরিয়া আসিল। লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। অর্জুন জানু পাতিয়া, করে কর লইয়া সেই বন্ধন খুলিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রাণে যেন অমৃতধারা বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণে তবে সে বন্ধন খুলা গেল।

অর্জুন। ভদ্রা, করিল বন্ধন
কে তোমারে?

কি শোভা ভদ্রার আজি—
ফুল কণ্ঠহার.
পূর্ণিমার চন্দ্র বেষ্টি নক্ষত্র-বিহার

* * *

শোভিছে সুভদ্রা যথা
কুসুমিতা বিদ্যুল্লতা

* *

অপরাজিতাবরণী শৈলজার মুখে বিষাদের ঘনান্ধকার—
নীরদের ছায়া যেন নীল সরোবরে

* * *

রূপিণী সত্যভামা—
চলিলেন রাজবালা
পুষ্পবনে পুষ্পমালা
জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নার তরঙ্গ তুলিয়া।

কবির আর একটী কালিদাসি গুণ আছে। এগুণ কথায় বুঝাইবার নহে, ইহা প্রাণের কাণে অনুভব করিতে হয়। উজ্জয়িনী-কোকিলের সেই কলকণ্ঠ (যাহা অতুলনীয়, অননুকরণীয়, যাহা জগতের অতি অল্প কবিরই আছে, জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' যাহার ছায়া-প্রতিকৃতি মাত্র,) সেই ললিত মধুর ঝঙ্কার যেন এ কবির প্রাণে বাজিয়াছে, অনুমান হয়। একটী দুইটী দৃষ্টান্তে ইহা বুঝান যাইবে না; তবে একটী তান আমার কর্ণে লাগিয়া আছে, সেই এই—

কই চমকিয়া বামা
উঠিল না সত্যভামা— [ইত্যাদি]

সুভদ্রা নীরব। অনেকবার জিজ্ঞাসা করায়, অধোমুখে উত্তর দিলেন,—'সুলোচনা'।

অর্জুন। সুলোচনা? কে? কোন্ দোষে?

সুভদ্রা নিরুত্তর। অতি কষ্টে 'চিত্র'।

অর্জুন। চিত্র? বিচিত্র উত্তর!

কি চিত্র? কাহার চিত্র? কি হয়েছে তার?

চিত্র অর্জুনেরই। সুভদ্রা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। অসহায়া বালা বসুধার কোলে আশ্রয় যাচিল। ভাগ্যফলে, শিশু মন্মথ আসিয়া ভদ্রার সহায় হইল। তাহার ফুলধনু, ফুলতূণ, ফুলের কিরীট। শিশুটি কৃষ্ণের পুত্র কামদেব।

ফুল চোক্ ফুল মুখ ফুল ধনুখান
ফুলের পুতুল যেন ফুলে শোভমান।

শিশু আসিয়া ভদ্রার কেশান্ধকারে মুখ লুকাইয়া কাণের কাছে চুপে চুপে বলিল, —

সেই ছবিখানি—সেই এঁকেছিলে তুমি
ছোট মা করিল চুরি—
এই দেখ! চুরি করি আনিয়াছি আমি।

মন্মথ ছবিখানি পিসীমাকে দিতে যাইতেছিল, অর্জুন কাড়িয়া লইলেন। একি! এ যে তাঁহারই চিত্র?

তবে কি ভদ্রা তাঁহার অনুরাগিণী? আশায়, উৎসাহে, কৃতজ্ঞতায়, অর্জুনের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল। তিনি একদৃষ্টে ছবির পানে চাহিয়া রহিলেন।

শিশুকাম, এই অবসরে ধনু আস্ফালিয়া জিজ্ঞাসিল,—

মম সনে তুমি করিবে সমর?

অর্জুন (হাসিয়া) না বৎস ! কামারি আপনি
নাহি সাধ্য তব সনে করিবেন রণ।
শিশু। কেমন সুন্দর বাণ কেমন ভূষণ
দিয়াছে আমায় দেখ পিসীমা আমার
তোমার ধনুক কই ? আছে কি এমন ?
অর্জুন। না বৎস, কোথায় পাব ? পিসীমা তোমার
যেই ফুলবাণে বৎস, সাজান তোমারে
করেন আহত মাত্র হৃদয় আমার।

শিশু উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল,—
তবে—তবে পিসীমার সঙ্গে রণে—তবে
নাহি পার তুমি ?
অর্জুন। সত্য কহিয়াছ বাছা,
বিনা যুদ্ধে তাঁর কাছে জিত ধনঞ্জয়।

শিশু আনন্দে ভদ্রার গলা জড়াইয়া বলিল,—
দেখ পিসীমায় আমি কত ভালবাসি
তুমিও কি বাস ?
অর্জুন। বাসি বৎস মনমথ,
আমায় কি পিসী তব বাসে সেই মত ?

শিশু ভদ্রার মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসিল,—
বাস পিসীমা ? বাস ?

ভদ্রা নিরুত্তর। লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া অধোমুখে রহিলেন। শিশু উত্তর না পাইয়া হাসিয়া বলিল,—পিসীমাও বাসে।

এমন আর শুনিব কি ? প্রথম প্রণয়ের এমন সুন্দর গান আর শুনিব কি ? কখন শুনিয়াছ কি ? হাঁ, শুনিয়াছি। আর একদিন

শুনিয়াছি। মালিনী নদীর কূলে, বেতস-কুঞ্জ-কুটীরে, বিসিনী-পত্র-শয্যায়, মৃণাল উপাধানে, কুসুম-আস্তরণে, শিশির-পবনে আর একটী কানন-কোকিলার কল কণ্ঠ শুনিয়াছিলাম। সে আজ বহুদিন হইল। তখন স্বর্গের কবি, মানুষ সাজিয়া, উজ্জয়িনীতে মানবীর প্রেম-অভিনয় দেবভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন।

দিনের পর দিন বহিয়া চলিল। অর্জুনের হৃদয়ে ভদ্রার ছায়া স্ফুটতর হইল। ভদ্রার প্রেম বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চিত হইয়া প্রাণ প্লাবিত করিল। সহৃদয়া সত্যভামা ননন্দার মনোভাব বুঝিলেন। মহা-মানসজ্জা করিয়া কৃষ্ণকে জানাইলেন,—(সত্যভামা স্বভাবতই কিছু মানিনী।)

দিব বিবাহ ভদ্রার
মধ্যম পাণ্ডব সনে !

কৃষ্ণ বলিলেন,—ভালই ত, 'কিন্তু তুমি
জান, সত্য, প্রতিজ্ঞা আমার—
ভদ্রা উদাসিনী যারে
চাহিবে বরিতে, তারে
দিব সুভদ্রার পাণি।

ভদ্রা যে পার্থানুরাগিণী কে বলিল ?

সত্যভামা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন, সেই চিত্র আনিয়া কৃষ্ণের সম্মুখে ধরিলেন।

ভগিনীর গুণ
দেখ ভ্রাতা চক্ষু মেলি—চিত্র মনাগুণ।

কৃষ্ণ বুঝিলেন, তাঁহার এত কালের আশা ফলবতী হইয়াছে।

কিন্তু আর এক সঙ্কট উপস্থিত। কথিত হইয়াছে, বলরাম দুর্বাসার স্তবে ভুলিয়া দুর্যোধনকে ভদ্রাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কাহারও

মানা, কাহারও অনুনয় শুনিবেন না। দুর্যোধনকে আনিতে দূত প্রেরিত হইল। রুক্মিণী কাঁদিয়া আকুল। সত্যভামার হৃদয়ে তামসী ছায়া পড়িল। আর সুভদ্রা ?

যদিও প্রসন্ন মুখ রাখে ভদ্রা পূর্বমত,
সেইরূপ শান্তির প্রতিমা।
তথাপি হৃদয় তার কি যে করিতেছে আহা
সে দুঃখের নাহি বুঝি সীমা॥

কৃষ্ণ জানিতেন, জগতের মঙ্গলময় নীতি কখনও অন্যথা হইবে না। তাই তিনি অনাকুল। সত্যভামা ও রুক্মিণী পরামর্শ করিলেন যে, অর্জুন ভুজবলে সুভদ্রাকে হরণ করুন।

অর্জুন সেই অপরাহ্নশেষে ,সেই পুরোদ্যানে, চিন্তাকূলমনে পাদ-চারণ করিতেছেন। মনে কতই চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়া লীন হইতেছে। একবার ভাবিলেন, সুভদ্রা-হরণ করিয়া, এ সঙ্কট-পাশ ছিন্ন করিবেন।

যাদব বিক্রম-সিন্ধু মথি ভুজবলে
পারি উদ্ধারিতে এই অমৃত শীতল

কিন্তু তখনি মনে হইল,—

কিন্তু হলাহল
উঠে যদি সে মন্থনে—কৃষ্ণের বিরাগ !

অর্জুন আকুল হইলেন। সহসা শান্ত, স্থির, চিন্তাশীল, একটী মুখশ্রী তাঁহার নয়নে ভাসিয়া উঠিল। সুভদ্রা অশোকমূলে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছে। চারি চক্ষের মিলন হইল। অর্জুন সেই অশোকমূলে গেলেন।

সুভদ্রা এই কয়দিনে একটু মুখরা হইয়াছে। ফুল্ল কমলিনী বুঝি ভ্রমর গুঞ্জন সহিতে শিখিয়াছে।

অর্জ্জুন বলিলেন—(ভদ্রার কাল শুভ বিবাহ,)—

পাইলাম এই বনে আজি সুভদ্রার
দ্বাপরের সীতাসহ শেষ দরশন।

কিছুক্ষণ নীরব রহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে—

যার উপাসনা
করেছি জীবনব্রত, সেই দেবী মম
লইবে কাড়িয়া পরে, কাপুরুষ মত
সহিব কেমনে বল, ক্ষত্রিয় শোণিতে!

সুভদ্রা— সুভদ্রা তোমার
একটী চরণরেণু নহে সমতুল

* * * *

তুচ্ছ নারী তরে
কেন বীরচূড়ামণি পাও মনস্তাপ।

অর্জ্জুনের হৃদয় আজ শুষ্ক মরুভূমি। তিনি বলিলেন,—

ভদ্রা নারায়ণ-সেবা—জীবনের ব্রত,
লইয়াছে ধনঞ্জয়। করিওনা তারে
ব্রতহীন ধর্ম্মহীন।

দেও অনুমতি
হরিব সুভদ্রা-সুধা নমি সুদর্শন।

সুভদ্রা। জানি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কিন্তু বীরমণি
নররক্তে রৈবতক করিয়া রঞ্জিত

* * * *

নরমুণ্ডমালা
পরাবে গলায় প্রভু, তব সুভদ্রার!

অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রক্তাক্ত করে তিনি কখনই ভদ্রার কর স্পর্শ করিবেন না।

প্রতিজ্ঞা আমার
নিবারিব অস্ত্র, নাহি করিব প্রহার। *

উভয়ের নয়নে ত্রিদিব ভাসিয়া উঠিল। প্রাণ শান্তিসুধারাশিতে পূর্ণিত হইল।

সহসা শঙ্খধ্বনি। অর্জুন ফিরিয়া দেখিলেন, সত্যভামা, সঙ্গে সখী সুলোচনা। চারিটি হৃদয় একতানে বাজিয়া উঠিল। সত্যভামা উচ্ছ্বসিত প্রাণে সুভদ্রার কর অর্জুনের করে দিয়া বলিলেন,

ধনঞ্জয়, করিলাম আজি সমর্পণ
তব করে সুভদ্রায়—সাক্ষী নারায়ণ।

পরে আপন প্রকোষ্ঠ হইতে বলয় খুলিয়া পরাইয়া দিয়া,—

হও সুভদ্রার পতি, করিনু বরণ
শুভক্ষণে এই রাখী করিয়া বন্ধন।

সমগ্র জগৎ সম্মুখীন হইলেও,

রাখিও রাখীর মান—এ দাসীর পণ।

এইবার বিদায়কাল উপস্থিত। এতদিনের আপনার সুভদ্রা আজ পর হইল। জীবনের এই সুখ-দুঃখের অঙ্ক হিন্দুর ঘরে ঘরে নিত্য অভিনীত হয়। তাই বুঝি হিন্দু কবি এ চিত্র এমন সুন্দর আঁকিতে পারেন। কালিদাস, দেবতুলিতে কণ্বের শান্ত আশ্রমে এই বিষাদচিত্র

---

* পাঠক, এইখানে কাশিদাসী সুভদ্রাহরণ মিলাইয়া দেখুন। এই একটী রেখা পাড়িয়া নবীনবাবু অর্জুন-চরিত্র কেমন উন্নত করিয়াছেন! করুণাময়ী সুভদ্রার করুণ হৃদয়ের ছবিও কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে!

আঁকিয়াছেন। জগতের কাব্যে তাহার তুলনা নাই। তিল তিল করিয়া বিষাদ সঞ্চিত হইয়া, হৃদয় ভাসাইয়া নয়নে বহিয়া পড়ে। রৈবতকের এই সর্গ পাঠ করিয়া, আমার সেই হর্ষ-বিষাদময়ী শান্তি প্রতিমা শকুন্তলাকে মনে পড়ে,—সেই লতাভগিনী, সেই পাদপ-সখী, সেই হরিণীসোদরা, সেই সখী-অন্তপ্রাণ শকুন্তলাকে মনে পড়ে। রৈবতকের এ সর্গ পড়িয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না।

অভিমানিনী, প্রগল্‌ভা, পরিহাসপ্রিয়া সত্যভামা সাশ্রুনয়নে—

আজি মম কি সুখের কি দুঃখের দিন
আয় ভদ্রা আয় বুকে,

সুভদ্রার মুখচুম্বন করিয়া কাঁদিয়া আকুল,—

এই মুখ এই চোক এ দেবীমূরতি
পুণ্যের স্বপন-সৃষ্টি, দেখিব না আর
নিত্য নিত্য নিত্য নাহি শুনিবে শ্রবণ
শীতল প্রীতির ধারা কণ্ঠ বরিষণ।

আর সুলোচনা? যার প্রাণে দিবানিশি পরিহাসের উৎস খেলিয়া বেড়ায়, যাহার বিষাদ-রোদনেও হাসির সমাবেশ দৃষ্ট হয়, মুখরা * প্রগল্‌ভা † সুলোচনা আজ পরিহাস ভাসাইয়া, হাসি ভুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

---

* অর্জুন। পশিয়া নিবিড় বনে
হারাইনু পথ, আমি—
সুলোচনা। "আসিলাম শেষে
রমণী উদ্যানে ভ্রমে।" বীর ধনঞ্জয়
মৃগ তাঁর নারীজাতি—

† কৃষ্ণ। গালি দিস্ বিষমুখি! টানি বজ্রজিহ্বা তোর
সাজাইব অনার্যের কালী।

না না ভাই, পারিব না সহিতে এ প্রাণে
পরের হইবি তুই, হবে তোর পর
সুলোচনা! দুই লতা গেছে জড়াইয়া
আশৈশব প্রাণে প্রাণে, বিচ্ছিন্ন এখন
কেমনে হইব বল।

হৃদয়ে ঝটিকা বহিল। উচ্ছ্বাসে প্রাণ আকুল হইল।

আয় বোন আয়
বারেক গলায় আয়, আসি জড়াইয়া
দুইলতা এত দূর তুই বোন আজি
শুভক্ষণে সহকার করিয়া আশ্রয়
ছুটিলি আকাশ মুখে, কিন্তু পদমূলে
উভয়ের আমি বোন্ পাই যেন স্থান
তোর ফুলে তোর ফলে জুড়াইতে প্রাণ।

সুভদ্রা কাঁদিয়া বলিলেন—

দিদি তোমাদের আমি।

সুলোচনা দুঃখ চাপিয়া মুখের হাসি হাসিতে গেল। শাঁক বাজাইয়া বিবাহ-উৎসব পূর্ণ করিতে গেল। কিন্তু শাঁক বাজিল না। *

সুলোচনা। বোকা পুরুষের বুকে
নাচি তবে মনসুখে
রণরঙ্গে দিয়ে করতালি।
বজ্রাস্ত্র জিহ্বায় ধরি বরুণাস্ত্র নেত্রকোণে
করে বজ্র ধরি ভীম ঝাঁটা।

* * * *

* সুলোচনার হাসির তরঙ্গে একটী বিষাদের মেঘচ্ছায়া সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সে বালবিধবা। তাহার প্রেমে প্রতিদানের আশা নাই। তবুও অজ্ঞাত স্বামীর ছায়াচিত্র প্রাণে আঁকিয়া রাখিয়াছিল।

কত ফুঁ, তথাপি শাঁক বাজিল না ভাল
কি যেন রোধিল চারু কণ্ঠ বাদিত্রীর।

পরদিন প্রভাতে পুরনারীগণ দেবার্চনায় দ্বারকাভিমুখে যাইতেছেন, পথিমধ্যে অর্জুন মৃগয়াচ্ছলে দারুকের রথে চড়িয়া সুভদ্রা হরণ করিলেন।

শত ভেরী বাজিয়া উঠিল। রথের ঘর্ঘর, তুরঙ্গের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত ও যদুবীরগণের সিংহনাদে, আকাশ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। অর্জুন রণক্ষেত্রে—অগ্রসর হইলেন। দারুক রথ চালাইতে অসম্মত হইলে,

নিলা রশ্মি করে সুভদ্রা শোভিল
মৃণালেতে মৃণালিনী—

সম্মুখ সমরে পড়িলেন পতি
এই মাত্র জানি আমি
সম্মুখ সমরে পড়িলেন পতি,
এই স্মৃতি মম স্বামী

তাই সে 'ফুলের প্রণয়, ভাষার গান' গাহিয়া, একাকিনী মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া রোদন করিতেছিল। বোধ হয়, ফুলের বৈধব্যে আপনার অদৃষ্টের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইয়াছিল,—

প্রেমের বিধবা শেষ ওই সেফালিকা রে
আঁধারে আঁধারে ফুটে
আঁধারে ভূতলে লুটে
কাঁদি সারানিশি পড়ি অশ্রুভারে ঝরিয়া
মাটীতে রাখিয়া বুক
জুড়ায় মনের দুখ
আপন সৌরভে থাকে আপনিই মরিয়া।

এইখানে আমরা দেখিলাম, সুভদ্রা শুধু শিরীষ ফুল নহে,

পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।

ভদ্রাও বোধ হয় প্রমীলার মত বলিতে পারিত,—

অধরে ধরি লো মধু গরল লোচনে
নাহি কিরে বল এ ভুজমৃণালে?

তুমুল সংগ্রাম বাধিল। একদিকে অসংখ্য যদুবীর, আর একদিকে একেশ্বর অর্জুন। একদিকে ক্রূর জিঘাংসা, অন্যদিকে প্রশান্ত আত্মরক্ষা। এ যেন খেলা-ঘরের রণক্রীড়া,—

হাসে ধনঞ্জয়, অস্ত্রে অস্ত্র কাটে
নাহি করে অস্ত্রাঘাত।
রণস্থলে প্রভু, হয় নাই এক,
বিন্দুমাত্র রক্তপাত?

আবার ভেরী গর্জন! সংগ্রাম ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে।

কৃষ্ণ বলরাম সুখে সভাসীন ছিলেন। সেখানে এ সংবাদ, ভেরী-বাহিত হইয়া পঁহুছিল। বলরাম ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন; দুন্দুভিনির্ঘোষে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

না লঙ্ঘিলে হলায়ুধ মৃতকলেবর
না পাইবে ধনঞ্জয় সুভদ্রার কর।

কৃষ্ণের সানুনয় সান্ত্বনা, ভাগীরথী-স্রোতে ঐরাবতের মত ভাসিয়া গেল। রণস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন,

ও কি দৃশ্য! চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুভদ্রার করে ধনু
চরণে রথের রশ্মি
পৃষ্ঠে মুক্ত কেশঘন বর

পার্থের মূর্চ্ছিত দেহ
করিতেছে সংরক্ষণ
ব্যর্থ করি সাত্যকির শর

বলরাম দেখিয়া ছল ছল নেত্রে,
ধন্য রে সুভদ্রা তুই
ধন্য আজি যদুকুল

বলিয়া জয়নাদ করিয়া উঠিলেন। অর্জুন মূর্চ্ছান্তে,
প্রেমাশ্রু নয়নে চাহি,
রণ-রঙ্গিণীর পানে
লইলেন করে ধনুঃশর।

দ্বিগুণ উৎসাহে যদুবীরগণের শরজাল প্রতিহত করিয়া, কাহাকেও নিরস্ত্র কাহাকেও রথভ্রষ্ট করিলেন। প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে সর্বাঙ্গ বাহিয়া রক্তস্রাব হইতেছে, অথচ কাহারও অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলেন না।

বীরত্বে বীরের প্রাণ মোহিত হইল। বলরাম 'জয় ভদ্রার্জুন জয়' গাহিয়া, শান্তির আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

এই সুভদ্রা-চরিত্রের সমালোচনা। এখন জিজ্ঞাস্য এই,—এ চরিত্র দেবীর না মানবীর? বোধ হয়, দুয়ের মিশ্রণে যে দেবী-মানবীর সৃষ্টি হয়, তাহারই।

বাঙ্গালার সর্বপ্রধান তিন কবি, তিনটী রমণী-চিত্র আঁকিয়াছেন,—মধুসূদনের প্রমীলা, হেমচন্দ্রের ইন্দুবালা ও নবীনচন্দ্রের এই সুভদ্রা; তিনটীই অপূর্ব সৃষ্টি; বোধ হয়, প্রমীলা সৌষ্ঠবে সর্বশ্রেষ্ঠা; মধুরতায় ইন্দুবালা কি সুভদ্রা শ্রেষ্ঠতরা, নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু দিব্যতায়, অতুলনীয় অপার্থিবতায়, কেহই সুভদ্রার সমকক্ষ নহে।

(৫)

কবি আর দুইটি দিব্যাঙ্গনার চরিত্র আঁকিয়াছেন ; কিন্তু তাহাদের চরিত্রের সবটুকু আমাদের দেখান নাই। যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতেই প্রাণ উৎফুল্ল হইয়াছে। শেক্ষপীয়র, যেমন একতুলিতে গনারিল ও রিগন আঁকিয়া, একটু বর্ণের তারতম্যে চরিত্র-বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছেন, আমাদের কবিও, সেইরূপে রুক্মিণী ও সত্যভামার চরিত্র, এক ছাঁচে ঢালিয়াও বিচিত্র করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই দুই চরিত্রের মূলতত্ত্ব, আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিতে পাই,—

রুক্মিণী ও সত্যভামা, নিষ্কাম সকাম দুই
ভার্যারূপী প্রেম অবতার।
পবিত্র যমুনা গঙ্গা, বহে এক সিন্ধু মুখে
আমি সেই পুণ্য পরাবার।
সরল সকাম বেদ, ভক্তিময়ী সত্যভামা
জ্ঞান উপনিষদ রুক্মিণী।
নির্জীব সকাম ভাব, আছে তাহে লুক্কায়িত
অন্তঃশীলা প্রীতি প্রবাহিণী।

সত্যভামা অভিমানিনী, পরিহাসপ্রিয়া, প্রগল্‌ভা ও ঈষৎ গরবিণী ; রুক্মিণী কান্তিময়ী, লাজশীলা, ঈষৎ চিন্তাশীলা, একেবারেই আত্মাদর-বিরহিতা।* উভয়েই সহৃদয়া, উভয়েই করুণাময়ী, তবে রুক্মিণীর

---

* ... ... নহে শত সত্যভামা, রুক্মিণী সহস্র শত
তাঁর এক ধূলির সমান।

* * *

কি যে অভাগিনী আমি, পতিসেবা নাহি জানি
আপনি মরমে মরে রই।

আকাশে মলিন মেঘ, দেখিলে অভাগী তুই
মরমেতে মরিস্ কাঁদিয়া—

*   *   *   *

অবিরত পরদুঃখ অবিরত অশ্রুজল
নিরন্তর কাঁদিয়া আকুল।

সত্যভামার করুণায় একটুকু কঠোরতা আছে, রুক্মিণীর হৃদয়ে তাহার লেশমাত্র নাই। সত্যভামার মতে,

তরঙ্গ-বিহীন, সে প্রেম কি প্রেম
ক্ষুদ্র সরসীর জল।
মহাপারাবারে কভু শান্তি কভু
উত্তাল তরঙ্গ দল।

*   *   *   *

হাসিতে জ্যোৎস্না বাঁধিতে বিদ্যুৎ
গর্জিতে অশনি প্রায়।
না পারে যে প্রেমে সেই তুচ্ছ প্রেম
সত্যভামা নাহি চায়।

তাই তাহার প্রেমে, মানের রুচিকাভাসের বিদ্যুৎ ও অভিমানের বর্ষা, এক কথায়, তাঁহার প্রেম সকাম। আপনা হারাইয়া, প্রিয়জনে মিশিতে পারে নাই।

জগৎ কি নাহি জানি, তুমি আমারই স্বামী
তুমি সত্যভামার সংসার।
জগৎ যে হয় হোক্, তুমি যে সত্যভামার
সত্যভামা তেমতি তোমার।

রুক্মিণীর প্রেম—অগাধ, অতলস্পর্শ, নিবাতনিষ্কম্প সিন্ধুবক্ষের মত প্রশান্ত; স্থির, অচঞ্চল।

নর-নারায়ণ রূপ, নিরখি নয়নে যেই
আপনার ক্ষুদ্রত্বে মরিয়া
ইচ্ছা হয় মনে মনে, চিরজীবনের তরে
পদপ্রান্তে পড়ি ঘুমাইয়া।

অর্থাৎ, রুক্মিণীর প্রেমে, আর মমত্বের বিকাশ নাই। ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী যেমন মহাসিন্ধুতে মিশিয়া, সিন্ধু হইতে অভিন্ন হয়, রুক্মিণীও সেইরূপ কৃষ্ণপারাবারে মিশিয়াছেন, তাই তার প্রেম নিষ্কাম।

পত্নী তাঁর নারীজাতি, পত্নী তাঁর বসুমতী
পত্নী তাঁর অসংখ্য অপার।

* * *

তাঁর প্রেমে ক্ষুদ্র কীট পায় যাহা ততোধিক
আমাদের নাহি অধিকার।

এক কথায় সত্যভামার প্রেম মানবীর, রুক্মিণীর প্রেম দেবীর।

কবি-কল্পনার বোধ হয় শেষ নাই; তাই, কবি, চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া, চিত্রপট ভরাইয়াও ক্ষান্ত নহেন। জরৎকারু-চরিত্রে, আমরা অনার্য রমণীর এক চিত্র দেখিয়াছি। আর এক অপূর্ব চিত্র এই শৈলজা। পারিজাত, যেমন নন্দনবনের শোভা সম্পাদন করে, শৈলজার চরিত্র-শোভায় তেমনি রৈবতক অলঙ্কৃত। অতুল রূপ, অমৃতভরা হৃদয়, অদ্ভুত সাহস, অকৃত্রিম প্রেম, অযাচিত আত্মত্যাগ, নিরাশার অতুল শান্তি, সকল মিশিয়া, শৈলজা এক অপূর্ব সৃষ্টি হইয়াছে।

শৈলজা নাগবালা; আর্য-বিপ্লবে তাহার পিতা-মাতা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, বনে বনে অচলে অচলে বহু বৎসর লুকাইয়া রহিলেন। শেষ, সুনীরার তীরে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই কুটীরে

শৈলজার জন্ম হয়। স্নেহময় জনক-জননীর ক্রোড়ে, শৈলজার সুখের শৈশব বহিয়া গেল। স্থলে জলে কৈশোর খেলায়, আর্যভাষা ও অস্ত্র-সঞ্চালন শিক্ষায় শৈলজার আট বৎসর কাটিয়া গেল।

একদিন শৈলজা পীড়িত হইলে, পিতা, দুগ্ধের অন্বেষণে ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। এক ব্রাহ্মণের গোধন গ্রহণ করায়, অর্জুন আসিয়া পথরোধ করিলেন। অসীম সাহসে, অনেক যুঝিয়া, নাগপতি অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। অর্জুন শুনিলেন, নাগপতি দস্যু নহে। পীড়িত কন্যার দুগ্ধানুরোধেই তাহার এই তস্করতা। অর্জুনের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল। শিশু অনাথার অন্বেষণে আট বৎসর ধরিয়া, দেশবিদেশে ঘুরিয়া অবশেষে রৈবতকে উপস্থিত হইলেন।

শৈলজার কুটীরে শোক-সমাচার পঁহুছিল। শোকে জননীর জীবনপাশ ছিন্ন হইল। শৈলজা মার বুকে পড়িয়া কত কাঁদিল, কত ডাকিল। শেষে মূর্চ্ছা আসিয়া, বালিকার শোকে শান্তি বিধান করিল। সেই অবধি শৈলজা, বাসুকির আলয়ে পালিতা হইতেছিল। এখন সুযোগ পাইয়া, বাসুকি আদেশ করিলেন,—

পিতৃহন্তা তোর
আসিয়াছে রৈবতকে,—
ছদ্মবেশে করি তার দাসত্ব গ্রহণ
কাল ভুজঙ্গিনী মত করিবি দংশন।

শৈলজার হৃদয়ে প্রতিহিংসা-বহ্নি তুষাগ্নির মত ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল। এখন ইন্ধন-সংযোগে বাড়িয়া উঠিল। শৈলজা, পুরুষ সাজিয়া, অবসর খুজিতে লাগিল।

রৈবতক-পুরোদ্যানে, একদিন অর্জুন, এক বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আছেন, হঠাৎ এক ভীষণ উরগ তাঁহার পদতলে খসিয়া পড়িল। অর্জুন

চমকিয়া দেখিলেন যে, তীক্ষ্ণ শরে তাহার বিষফণা বিদ্ধ। কিছু অন্বেষণে বুঝিলেন, ষোড়ষ বর্ষীয় এক সুন্দর বালক, অদ্ভুত কৌশলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

অর্জুন। কি নাম তোমার ?
দিয়াছ জীবন মম কি দিব তোমায় ?

শৈল। শৈল নাম তার
সেবিবে চরণাম্বুজ ভিক্ষা চাহে আর।

সেই অবধি, শৈলজা অর্জুনের ভৃত্য হইল।

রৈবতকে আজ উৎসব রজনী। গৃহে গৃহে নৃত্যগীত, গৃহে গৃহে উৎসব অর্চিকা ও আনন্দধ্বনি; কিন্তু এ উৎসবে শৈলের হৃদর ভরে নাই। বালিকা, চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে। মুখে চিন্তার রেখা, নেত্র অনিমেষ।

বালিকা কি ভাবিতেছিল? পিতৃহন্তার তপ্তশোণিতে কি করিয়া প্রতিহিংসাবহ্নি নির্বাপিত করিবে? জানি না। ক্রমে নিশি দ্বিতীয় প্রহর হইল। ধনঞ্জয় উৎসবান্তে গৃহে আসিয়া অঙ্গভূষা খুলিতেছিলেন, শৈল আসিয়া প্রভুর সহায়তা করিতে লাগিল। অর্জুন দেখিলেন, বালক এখনও নিদ্রা যায় নাই, তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

অর্জুন। শৈল, এত স্নেহ তব, প্রতিদান তার
দিব কোন্ মতে আমি ?

বালক প্রভুর চরণতলে পড়িয়া, ছল ছল নেত্রে চাহিয়া বলিল যে, প্রভুর চরণ সেবাই তাহার পরম পুরুষার্থ

—ততোধিক আর
নাহি জানে প্রতিদান, অনার্য কুমার।

অর্জুন শয়ন করিলেন। নিশা তৃতীয় প্রহর হইল; তথাপি, শৈল প্রভুর পদসেবা ত্যাগ করিবে না। শেষ, অর্জুন নিদ্রিত হইলেন। শৈল প্রীতিফুল্ল নয়নে, তাঁহার সুপ্ত মুখপানে চাহিয়া রহিল,—

কি আনন্দ যেন বহু তপস্যার পর
পেয়েছে সাধক নিজ অভীষ্ট ঈশ্বর।

শৈলের এত ভক্তি কি ইষ্টসিদ্ধির প্রতারণা? বোধ হয় না। কই, নিদ্রায় সুযোগ পাইয়া ত সে পার্থের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইল না?

শৈল ঘোর হিংসানল, হৃদয়ে বহন করিয়া, রৈবতকে আসিয়াছিল। কিন্তু অর্জুনের প্রীতিপূর্ণ মুখ, 'বীরত্বের প্রতিকৃতি, দয়ার আধার' দেখিয়া, তাহার হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটিল। অর্জুনের শোকপূর্ণ অনুতাপ, 'অনাথার অন্বেষণ দেশ দেশান্তরে' শুনিয়া, বালিকার প্রাণ আকুল হইল,—

করিনু অর্পণ
পিতৃহন্তা পদে এই অনাথ জীবন'

* * *

ভাসিল কি স্বর্গ নেত্রে, বহিল হৃদয়ে
কি অমৃত মন্দাকিনী

কত সুখ-স্বপ্ন দেখিল; কিন্তু কিছু দিনেই সে আশার মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল। শৈল দেখিল, অর্জুন সুভদ্রাকাঙ্ক্ষী; ভদ্রার মুখই দিবানিশি তাঁহার হৃদয়াকাশে ভাসিতেছে। বুঝিল, অর্জুনের প্রাণ, তাহার প্রাণের তানে বাঁধা নয়। হৃদয় নিরাশায় পূর্ণ হইল।

কথিত হইয়াছে যে, বাসুকিরও সুভদ্রা-প্রেমাকাঙ্ক্ষা বলবতী।

আমায় সুযোগ দেখি দিবি সমাচার
হরিব সুভদ্রা চির-বাসনা আমার।

এই সুযোগান্বেষণই শৈলজার নিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য; কাল, কুমারী-ব্রত; কাল, যাদবীরা রৈবতকের নিভৃত শৈলে, দেবতার কাছে মনোমত পতি ভিক্ষা করিবে। নিরাশ প্রণয়ে আত্মহারা শৈল, এ সমাচার দিয়া আসিল। বাসুকি সসজ্জ হইলেন।

সহসা বালিকার ঈর্ষ্যাচ্ছন্ন হৃদয়ে আলোক ফুটিল। সুভদ্রা, তাহার পথের কণ্টক; কিন্তু পার্থ যে ভদ্রাকাঙ্ক্ষী—

উঠিল ভাসিয়া
ঈর্ষ্যার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আমার
পূর্ণ শশধর সম মুখ সুভদ্রার
সেই চন্দ্রালোকে ভরা হৃদয় তোমার।

বালিকা আত্ম-বলিদান দিল। আপনার সুখ ভাসাইয়া, পার্থের সুখে সুখিনী হইল। অর্জুনকে, বাসুকির দুশ্চেষ্টা জ্ঞাত করাইল।

পরদিন, যাদবী-কুসুমাকীর্ণ রৈবতক দেববনে দস্যুকোলাহল উত্থিত হইল। বাসুকি, দস্যুপতি সাজিয়া সুভদ্রা হরণ করিবে। অর্জুন সসজ্জ ছিলেন; আসিয়া দস্যুপতির পথরোধ করিলেন। কিন্তু কে বালক অদ্ভুত কৌশলে অজস্র শরজাল বর্ষণ করিয়া, দস্যুদল বিপর্যস্ত করিল—ঝড়ে যেমন শুষ্ক পত্ররাশি বিপর্যস্ত করে। কে বালক, মহাহবে অর্জুন শরাসন-ভ্রষ্ট হইলে, বিদ্যুৎগতিতে দস্যুপতির বজ্রমুষ্টিতে শরাঘাত করিয়া, পার্থের প্রাণরক্ষা করিল? সে বালক শৈল। শৈলজা ঈর্ষ্যা ভুলিয়া, নিরাশ প্রণয় ভুলিয়া, পার্থ-প্রণয়িনী ভদ্রাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিল। রণান্তে সুভদ্রা, কণ্ঠের হার খুলিয়া, কৃতজ্ঞতায় শৈলের গলায় পরাইতে গেলেন। শৈলজা কহিল,—

ভগিনি, প্রতিজ্ঞা মম
যেই এক হার, তপস্যা আমার

নাহি দিল যদি পাষাণ মন,

নিদারুণ-বিধি ; অন্তহার দিদি

পরিব না কভু গলায় আর

বিনা তাঁর স্মৃতি। লও উপহার

দিলাম তোমারে তোমারি হার।

সুভদ্রা দেখিলেন, বালকের নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু। সে দিন আর শৈলজার সন্ধান পাওয়া গেল না। আর একদিন। আর একদিন শৈল দেখা দিয়া কোথা বিস্মৃতি-আঁধারে লুকাইল। শৈলজা কত নিরাশায় বুক বাঁধিয়া, ভদ্রার্জুনের এই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। গান্ধর্ব-বিবাহ শেষ হইয়াছে। আজ মৃগয়াচ্ছলে রথারোহণ করিয়া, সুভদ্রা হরণ করিতে হইবে। নবীন উৎসাহে গাত্রোত্থান করিয়া অর্জুন দেখিলেন, রণসাজ সুসজ্জিত রহিয়াছে। আর শৈলজা,—বড় শান্ত কোমল সুশীতল দৃষ্টিতে, তাঁহার পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। সে নিরন্তরই এরূপ চাহিয়া থাকিত। রণসাজ পরিতে পরিতে অর্জুন বলিলেন, 'শৈল, আমার রৈবতক-বাস শেষ হইয়াছে। তুমি কি আমায় ছাড়িয়া আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে?' শৈল সাশ্রু-নয়নে কাতরে বলিল 'নাহি গৃহ এ দাসীর'। 'এ দাসীর!' অর্জুন বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, ভ্রম। সাদর-কণ্ঠে বলিলেন।

"শৈল, তবে চল হস্তিনায়।

পাবে প্রেমপূর্ণ গৃহ * *

হৃদয় তোমার

জগতে দুর্লভ বৎস!"

শৈলজা কিছু উত্তর করিল না, ছুটিয়া আপন কক্ষে গেল। অর্জুন

বিস্মিতের মত চাহিয়া রহিলেন। সহসা আরক্ত-বসন-ধারিণী, কুসুমদাম-শোভিনী এক যোগিনী মূর্তি ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল।

অপূর্ব যোগিনী মূর্তি মাধুরী মণ্ডিত
অপরাজিতার সৃষ্টি সদ্য সুবাসিত।

* * * *

নীলিমা এ রমণীর শারদ আকাশ
অস্ফুট চন্দ্রাভ শান্তি-করুণা-নিবাস।

পার্থ বিহ্বলের মত দেখিলেন যে, যে রক্তবাসে যোগী সাজিয়া, তিনি আজ আট বৎসর অনাথা শৈলজার অন্বেষণ করিয়াছেন, সেই বসন পরিয়া তাঁহার বালক শৈল! বিদ্যুৎ-উন্মেষের মত সকল কথা মনে প্রতিভাত হইল।

অর্জুন,—দেবী কি মানবী
কে তুমি? এরূপে কেন ছলিলে আমায়?

শৈলজা কত কাঁদিয়া, কত পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া, আত্মকাহিনী বিবৃত করিল। অর্জুন শুনিলেন, স্নেহের নির্ঝর শৈলই অনাথিনী শৈলজা। তিনিই তাহার পিতৃহন্তা, আর শৈলজা, বার বার তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়া, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ দিয়াছে।

উন্মত্তের মত
শোকের প্রতিমাখানি লইয়া হৃদয়ে
চুম্বিলেন বার বার, নীলাব্জ বদন
অশ্রুসিক্ত,

শৈলজার উচ্ছলিত শোকাবেগ, অর্জুনের মর্মস্পর্শী অনুতাপ, কবি, এমন জীবন্তভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, পাঠ করিয়া, অশ্রু সংবরণ করা

যায় না। রৈবতকের এ সর্গ, আমি অন্যূন পাঁচ বার পাঠ করিয়াছি, কিন্তু প্রতিবারেই আমার পাষাণ চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহিয়া দৃষ্টিরোধ হইয়াছে।

অর্জুন মনোবেদনায় অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

জনক শ্মশানে তব, দুহিতার মত
পালিব তোমায় আমি,—
চল ইন্দ্রপ্রস্থে শৈল—
হৃদয় তোমার
হবে মম শান্তিরাজ্য, এই ক্ষুদ্র মুখ
লইয়া হৃদয়ে আমি জুড়াইব বুক।

শৈল। দাসীরও বাসনা তাহা; দাসীর হৃদয়ে
যেই শান্তি রাজ্য নাথ, হয়েছে স্থাপিত
তুমি সে রাজ্যের রাজা * *
বিশ্বচরাচর
হবে সব পার্থময়। বনের কুসুম,
গগনের সুধাকর, নির্ঝর সলিল
হইবে অর্জুন মম; আমার হৃদয়
রহিবে অভিন্ন নিত্য অর্জুনেতে লয়।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি প্রাণেশ্বর
তুমি শৈলজার এক অনন্ত ঈশ্বর।

অর্জুন বাষ্পাকুললোচনে আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন। শৈলজা, আপনার গলার ফুলমালা লইয়া, অর্জুনের কণ্ঠে পরাইল। অশ্রু মুছিয়া, অর্জুন দেখিলেন, শৈলজা নাই! সেই অবধি শৈলজাকে কেহ আর দেখিতে পায় নাই।

(৫)

এতদূরে রৈবতকের চরিত্র-সমালোচনা শেষ হইল। অনেক কথা বলিতে হইল, অনেকেই হয় ত, বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন ; কিন্তু এ বিষয়ে আমার বড় দোষ নাই। পাঠকের যদি কাহারও সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা কবির সহিত, সমালোচকের সহিত নহে ; তিনি কেন এমন সুন্দর কাব্য রচনা করিলেন—যাহার সৌন্দর্যের বিশ্লেষণে এত কথা বলিতে হয়। আজকাল বাঙ্গালী কবিরা, যেমন সৌষ্ঠবময় নাটক ও কাব্য রচিতেছেন, নবীনবাবু কেন সেই জাতীয় কাব্য রচনা করিলেন না, তাহা হইলে ত, এক "কিম্ভূতকিমাকার" কথায় আমার সমালোচনা শেষ হইতে পারিত। কবির এত বড় অন্যায় !

পাঠক, শুনিয়া আরও বিস্মিত হইবেন যে, এখনও সব কথা শেষ হয় নাই। তাঁহার বিরক্তি-নাটকের শেষাঙ্ক এখনও অভিনীত হইতে আছে।

আমাদের কবির প্রাণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভোর। তাঁহার চক্ষু প্রকৃতির সৌন্দর্যে সমাকৃষ্ট হয়। রঙ্গমতী কাব্যে এ-কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ লক্ষিত হয়। পদ্মাবক্ষে তুমুল ঝটিকা, চন্দ্রালোকে কানন প্রভৃতির মনোহর শোভা, পার্বতী নির্ঝরিণী ও অনলকুণ্ড-বিশোভী চন্দ্রশেখর গিরিমালা : আর বনদেবীর প্রমোদ-কানন সেই রৈবতক বন,—পত্রে পত্রে কবির প্রকৃতি-উপাসনার সাক্ষ্য দিতেছে। কবি, রৈবতকে এ সৌন্দর্য-অবতারণার বড় অবসর পান নাই ; কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে শান্ত ব্যাসাশ্রমের যে সুন্দর বর্ণনা আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল বলিলে, অত্যুক্তি হইবে না।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাব্যে সমাবেশ, এ দেশে নূতন প্রণালী নহে। রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, কুমার, উত্তরচরিত ও কাদম্বরীর পাঠক একথা বোধ হয়, অস্বীকার করিবেন না। তা ছাড়া, শান্তিরসাস্পদে এই

আশ্রম বর্ণনা, বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস সকলেরই অনুমোদিত। একই বিষয় বর্ণিতে কোন্ কবি কোন্ পথের অনুসরণ করিয়াছেন, সহৃদয় পাঠক এ কথার আলোচনা করিলে, উৎকৃষ্ট কাব্যামোদ আস্বাদন করিবেন, সন্দেহ নাই।

আর একটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া, এ দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আজকালকার বিলাতী সাহিত্যে, 'কাব্যে দার্শনিকতা'র কবিতাময়ী আলোচনা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইউরোপে গেটেই বোধ হয়, এ প্রণালীর প্রবর্তক। ইংলণ্ডে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (Wordsworth), সেলি (Shelley), আর্ণল্ড (Arnold), সুইন্বার্ন (Swinburne) ব্রাউনিং (Browning), টেনিসন্ (Tennyson) সকলেই ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যেও দার্শনিকতা, ধর্ম, নীতি, সমাজতত্ত্বের ভূয়সী আলোচনা দৃষ্ট হয়। আমাদের গৌরবের কথা যে, এ দেশেও এ প্রণালীর প্রবর্তনা হইয়াছে। দশমহাবিদ্যায় হেমবাবু এবং এই রৈবতকে নবীনবাবু এ পথের পথিক হইয়াছেন।

বুঝিয়া দেখিলে, এ প্রণালী এ দেশে নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। বহুদিন হইল, আর্য ঋষি বুঝিয়াছিলেন যে, ষড়্দর্শনের নীরস অঙ্গে সরসতার নির্ঝরিণী না বহিলে, উচ্চতত্ত্ব সাধারণ হিন্দুর বোধগম্য হইবে না। তাই পুরাণশাস্ত্রের অবতারণা। বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবতে, উচ্চ-অঙ্গের কাব্যের সহিত যে উচ্চদার্শনিকতার সমাবেশ আছে, তাহা জগতে দুর্লভ। কিন্তু, গীতাই এ প্রণালীর চূড়ান্ত নিদর্শন।

অনেকের, 'কাব্যে দার্শনিকতার' প্রতি ঘোর বিদ্বেষ, ঘোরতর আপত্তি। তাঁহাদের মতে, 'ফুল্ল ফুল', 'মলয় পবন', প্রণয়-বিরহ ও প্রেমের মিলন বই কিছুই কাব্যের উপযোগী নহে। দার্শনিকতা দর্শনে থাকুক, বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানে থাকুক, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্বের আলোচনা

সাহিত্যে থাকুক, আপত্তি নাই; কিন্তু তাহাদের কাব্যে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। তাহাদের সমাবেশে কাব্যের কাব্যত্বের হানি হয়, কাব্য নীরস, অমধুর, অপাঠ্য দর্শনশাস্ত্রে পরিণত হয়।

উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, 'ফুল্ল ফুল', 'মলয় পবন', প্রণয়-বিরহ বা প্রেমের মিলনে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। ইহারা সুন্দর, সুতরাং, কাব্যের উপযোগী; কিন্তু দর্শনের উপর আপনি খড়্গহস্ত কেন? দর্শনে যে এক অপূর্ব সৌন্দর্য অন্তর্নিহিত আছে, তাহা কি আপনার নয়নে কখনও প্রতিভাত হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, আপনি নিতান্ত দুর্ভাগ্য; কাব্যামোদীর উৎকৃষ্টতম আনন্দানুভব আপনার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। কবিসৃষ্টিতে আপনি সৌন্দর্যের উপলব্ধি করেন; কিন্তু অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত কল্পনা-প্রসূত জগত্তত্ত্বে কি অণুমাত্র সৌন্দর্যাভাস পান না? কি সৃষ্টিতত্ত্ব, কি ধর্মতত্ত্ব, সর্বত্রইত সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত কল্পনার জীবন্ত বিকাশ দেখিতে পাই। বলুন দেখি, এই এক বিবর্তনবাদে, যে মহাকাব্য নিহিত আছে, আপনাদের সহস্র ফুলে, সহস্র চাঁদিনীতে, সহস্র প্রেমের রহস্যালাপে তাহার কণিকা-মাত্র আছে কি? তবে, কাব্যে দার্শনিকতা না থাকিবে কেন? দর্শন ত এই কাব্যের বিজ্ঞানময়ী আলোচনা বই আর কিছুই নহে; তবে, কাব্যে এই দার্শনিকতার কবিতাময়ী আলোচনা না থাকিবে কেন?

আমি স্বীকার করি, এ উচ্চ কাব্যের রসাস্বাদন জিহ্বার অত্যল্প অনুশীলন সাপেক্ষ। তাহা কি আপনাদের হয় নাই? তবে এত ইংরাজী পড়িয়া মাথামুণ্ড কি হইল। আপনারা বিলাতী নামে ভুলেন। সেই জন্য, ইতিপূর্বেই গেটে প্রভৃতি অনেকগুলি পাশ্চাত্ত্য কবির নামোল্লেখ করিয়াছি; আর একজন বিজ্ঞ সমালোচকের মত উদ্ধৃত করিয়া, আপনাদের মন ফিরাইতে চেষ্টা করিব। ম্যাথু আর্ণল্ড বলেন,—

"দিন দিন আমরা বুঝিতে শিখিব যে, কাব্যই জীবন-মরণের সমালোচনা করিয়া, আমাদের প্রাণে আশা-উৎসাহের সঞ্চার করে, সান্ত্বনার সুধা সেচন করে। কাব্যের অভাবে বিজ্ঞানের পূর্ণতা হইবে না। যাহা এখন আমাদের কাছে ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়, কালে, কাব্যই তাহার স্থান অধিকার করিবে।"

এ কথা যদি সত্য হয়, তবে সে দশমহাবিদ্যা ও রৈবতকের মত কাব্য। এমন সরস দার্শনিকতা জগতে দুর্লভ।

আর একজন বিলাতী সমালোচক এই ধরণেরই একটা কথা বলিয়াছেন। কথাটি প্রাচীন, কিন্তু বড় সারগর্ভ। গ্রন্থ-সমালোচনায় প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, মানব আত্মার উন্নতি পথে ইহা সহায় হইতে পারে কি? শ্রেষ্ঠ কাব্যপাঠে প্রাণের বন্ধন-পাশ ছিন্ন হয়, প্রাণের অপরিসরতা বিলুপ্ত হয়, প্রাণে সজীবতার সঞ্চার হয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যত্ব। অন্য লোকের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু রৈবতক আমি যতবার পাঠ করিয়াছি, তত বারই মনে হইয়াছে, যেন উন্নতির পথে একটু অগ্রসর হইয়াছি, যেন প্রাণের বন্ধন-পাশ একটু শ্লথ হইয়াছে, যেন প্রাণ একটু সজীব হইয়াছে, যেন পৃথিবীর মাটী ছাড়িয়া একটু ত্রিদিবের দিকে উঠিয়াছি, যেন জড়ময়তা ছুটিয়া, হৃদয় একটু অমরতায় পূর্ণ হইয়াছে, যেন সেই অজ্ঞেয়, চিন্ময় আদর্শ পুরুষের ছায়ার প্রাণে একটু সমাবেশ হইয়াছে। এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিয়া, এ প্রবন্ধের উপসংহার করি।

অদৃষ্টবাদ অতি পুরাতন কথা; সমগ্র ন্যায়দর্শন এ তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া রচিত। কবি, তাহার কেমন সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন।—

দুই অনন্ত জগৎ
মানস ও জড় সৃষ্টি, রয়েছে পড়িয়া।

ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র নর, খদ্যোতের মত
একটি বালুকা নাহি পারে দেখিবারে,
একটি বালুকা নাহি পারে বুঝিবারে
সেই দুই অনন্তের, রয়েছে পড়িয়া
কত তত্ত্ব রত্নরাশি গর্ভে উভয়ের
অদৃষ্ট তাহার নাম। মানিবে না কেন ;
মানবের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত।
কি ঘটিবে কোথা হ'তে মুহূর্তেক পরে
নাহি জানে অন্ধ নর।

কর্ম (Duty) ও ধর্মের কি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা।

বিশ্ব রাজ্য কর দৃষ্টি
সর্বত্রে সার্থক সৃষ্টি
কিবা কীট কি পতঙ্গ উদ্ভিজ্জ সলিল।
আকাশ নক্ষত্র ক্ষিতি অনল অনিল।
সেই অর্থ মূল ধর্ম
তাহার সাধন কর্ম
যার যত উচ্চ শক্তি, তত গুরুতর
কর্ম তার, দেখ সাক্ষী খদ্যোত ভাস্কর।

* * *

যাহাতে ধারণ যার, সেই পার্থ ধর্ম তার
সেই নীতিচক্র করে জগত ধারণ
সেই জগতের ধর্ম চক্র সুদর্শন।
তার সূক্ষ্ম অঙ্গ মাত্র
মানবের ধর্ম শাস্ত্র

ওই নীতি চক্র কার্য অশ্রান্ত জগতে
তিলেক নাহিক সাধ্য তিষ্ঠি কোনমতে।

বিবর্তনবাদ এ দেশে সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও আজকাল এ কথা আমরা পাশ্চাত্ত্যদিগের নিকট হইতে শিখিতেছি, এই সঙ্গে সমাজতত্ত্বেরও গোটাকতক নূতন কথা শিখিয়াছি। কবি, এ সকল তত্ত্বের যে কবিতাময়ী আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় কাব্যামোদে আপ্লুত হয়।

সমাজের বিবর্তনবাদ এইরূপ,—

স্থষ্টি স্থিতি লয় নীতি সর্বত্রে সমান
অলংঘ্য অপরিহার্য। শৈশব সমাজ
হাসে দেখি চন্দ্রমুখ, কাঁদে বজ্রাঘাতে,
কাঁপে ঝটিকার ত্রাসে। সমাজ কৈশোরে
যাগ যজ্ঞ নানা ক্রীড়া। যৌবনে তাহার
শৈশবের হাসি ত্রাসে, কৈশোর ক্রীড়ায়
ভরে না হৃদয় আর। তখন মানব
দেখে সেই ইন্দ্র চন্দ্রে নিয়মের দাস
সুন্দর শৃংখলে গাঁথা। মানব হৃদয়
হইয়া পিপাসাতুর, চাহে বুঝিবারে
সুদর্শন নীতিচক্র, নিয়ন্তা তাহার,
মহান্ বিজ্ঞান বিশ্ব।

এই সঙ্গে অবতার-তত্ত্বের কি সুন্দর ব্যাখ্যা!—

যুগ উপযোগী
চরম উন্নতি অবতারণ যখন
ঘটিয়াছে, সে যুগের সেই অবতার।

প্রথম সলিলে মৎস্য, সেই নীতিবলে
সলিল পঙ্কিল যবে কূর্ম অবতার;
পঙ্ক দৃঢ়তর যবে, আচ্ছন্ন উদ্ভিদে
হইল বরাহ সৃষ্টি; প্রাণীর শৃঙ্খল
ক্রমশঃ উন্নতি চক্রে হয়ে দৃঢ়তর
নরসিংহ অবতার। বিস্ময় মূরতি
অর্ধ পশু অর্ধ নর! ক্রমে পশুভাগ
তিল তিল যুগে যুগে হইয়া অন্তর
বিকৃত মানব মূর্তি জন্মিল বামন।
তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহার
জগত অরণ্যময়, হিংস্র জন্তু বাস।
ঘুরিল উন্নতি চক্র—স-কুঠার-কর
আসিল পরশুরাম। বাঁধিল সমর
বনে বনচর সহ; নাহি শরীরেতে
পশুভাগ, পশুবৃত্তি হৃদয়ে প্রবল,
পশু নির্বিশেষ নর। সেই পশুভাব
যে দিন হইতে হ্রস্ব হইতে লাগিল
সেই দিন জগতের যুগ বর্তমান
হইল সঞ্চার—
প্রশান্ত উন্নতি পক্ষে আসিল কৈশোর
কৈশোরের রামচন্দ্র প্রীতি-অবতার
ত্রেতার চরমোন্নতি।

রৈবতকের এই সোঽহং সর্গ, গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের অনুকরণে লিখিত। জগতের কাব্যে অতুল্য, সেই মহাধ্যায়ের মত, এই মহান্ উচ্চ

অপার্থিব সর্গের সমালোচনা অসম্ভব। তবে, এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, বাঙ্গালা কাব্যে এমন আর কিছু পড়িয়াছি মনে হয় না।

আর বিশ্বপদ্মে বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান-বর্ণনায়, কবি যে, কত চিন্তাশক্তি, কত দার্শনিকতা, কত কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কথায় বুঝান যায় না।

দেখিলাম সুশীতল আলোক-সাগরে
শোভিছে সহস্রদল। মৃণাল তাহার,
ক্ষুদ্র বসুন্ধরা শ্যাম, রয়েছে স্থাপিত
অনন্ত আলোক গর্ভে। শতদল-দল
শোভিতেছে সংখ্যাতীত সবিতৃমণ্ডল!
নয়নে লাগিল ধাঁধা! দেখিলাম যেন
বিরাট-মূরতি এক পদ্মে অধিষ্ঠিত।
চতুর্ভুজ, চতুর্দিক; শোভিতেছে করে
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; শোভে সমুজ্জ্বল
*　　　　*　　　　*
কিরণের পীতবাস, অনন্ত অসীম,
নীলমণিময় সেই মহা কলেবরে,—
*　　　　*　　　　*
অনন্ত অচিন্ত্য এক শকতি মহান্
সেই মহা বপুঃ হতে হইয়া নিঃসৃত,
*　　　　*　　　　*
করিতেছে মহাপদ্ম নিত্য বিমথিত।
*　　　　*　　　　*
সেই জ্ঞানাতীত শক্তি, সেই মহাপ্রাণ,
অবিচ্ছিন্ন সর্বত্রই আছে বিদ্যমান,

করিয়া অচিন্ত্য এক একত্ব বিধান ?
হইল বিরাট ধ্বনি—'দেখ, অন্ধ নর !
'প্রকৃতির পুরুষের মহা সম্মেলন ;—
'একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ সনাতন !
'প্রকৃতি পঙ্কজ, পুরুষের শক্তিরূপী নারায়ণ,
'উভয় অনিত্য, নিত্য, উভয় অব্যয় ।
'জন্ম মৃত্যু রূপান্তর। দেখ অধিষ্ঠিত
'বিশ্বাম্বুজে বিশ্বেশ্বর ! হতেছে জ্ঞাপিত
'জ্ঞান পাঞ্চজন্যে নীতি চক্র সুদর্শন ।
'নীতির লঙ্ঘন পাপ হতেছে দণ্ডিত
'ভীষণ গদায়, পুণ্য-নীতির পালন—
'শতমুখ-শতদল করিছে বর্ধন !'
ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥
